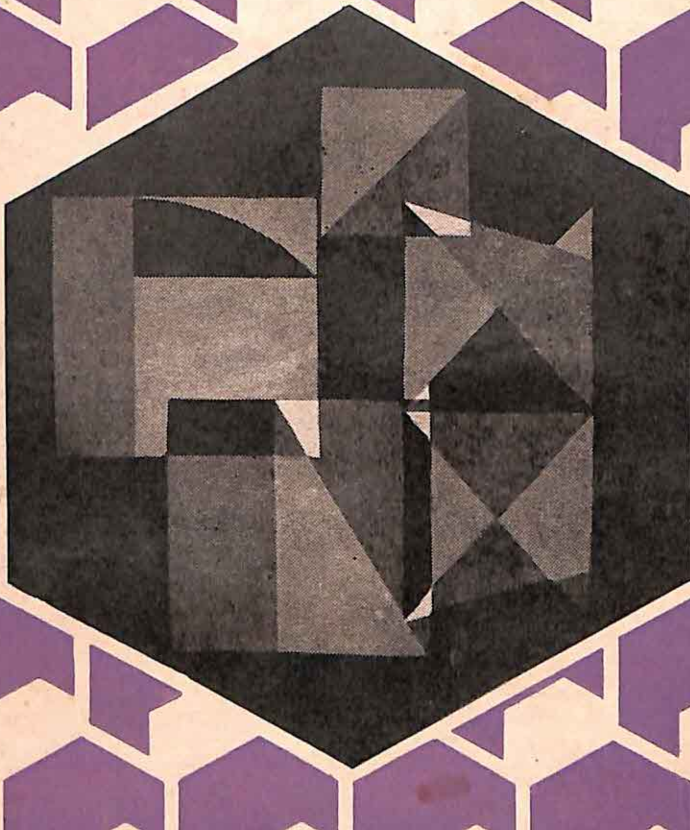
আমাদের দৃষ্টিতে গণিত

প্রদীপ মজুমদার



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

আমাদের দৃষ্টিতে গণিত

[Mathematics in our Views]

ডঃ প্রদীপ কুমার মজুমদার
এম. এস্. সি., পি. এইচ. ডি., এফ্. আই. এ. এইচ. পি. এস্.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

AMADER DRISTITE GANIT

By Dr. Pradip Kumar Majumdar

প্রকাশকাল—মার্চ—১৯৮২

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
নবম তল,
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
শ্রীজয়কৃষ্ণ ঘোষ
পাইওনীয়ার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৪৭/এফ্ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ ঃ বিমল দাস

Published by Prof Dibyendu Hota, Chief Executive officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books & literature in regional languages at the University level by the Government of India in the Ministry of Education & Social welfare (Department of culture), New Delhi.

উৎসর্গ

ডঃ মনীন্দ্র চন্দ্র চাকী এম. এ., পি. এইচ. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ গণিতের স্যার আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী অধ্যাপক এবং বিশুদ্ধ গণিত বিভাগের প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) মহাশয়ের করকমলে—

মাষ্টার মশাই,

আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য, অপরিমেয় কার্যক্ষমতা এবং সরল জীবন যাপন আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণা স্পৃহাই এ গ্রন্থ লিখতে উৎসাহিত করেছে। আপনার আদর্শই আমার উদ্যমকে সঞ্জীবিত রাখে। আপনার ঋণ এ জীবনে শোধ দেবার নয়, তবুও আপনার প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি আপনার নামে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম।

স্নেহধন্য

প্রদীপ কুমার মজুমদার

ভূমিকা

সাহিত্যের আঙ্গিনায় আমার পদচারণা অতি বিরল ঘটনা। গণিত চর্চা করতে এসে সাহিত্য রয়ে গিয়েছে স্মৃতির বিবর্ণ পাতায়। তবুও মনের নিভৃতে সাহিত্যের স্থান ছিল অতি সযতনে। সাহিত্যের আঙ্গিনায় যেদিন আমার ডাক পড়েছিল সেদিন বিস্মিত হয়েছি। ভেবেছি সাহিত্য এবং গণিত এই দুটি দিক চিন্তার দুটি ধারা, কিন্তু তবু মনে হয়েছে এ যেন নবোষার আলোকমাত্র স্ফুরিত হোলো, রক্তাধরা পূর্বদিগ্‌বধূর রাগময় চুম্বনে গগন কপোল রঞ্জিত হয়েছে। সেই প্রথম জাগ্রত প্রহরের স্নিগ্ধতার মধ্যে মনের আনন্দে আমি যেন একাকী পথ ধরে চলেছি। মনে হয় সম্মুখে বনবীথিকা। সেই বনবীথিকার ছায়াময় শান্তিতে যে চমকে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় কোন এক রহস্যের কুণ্ডলদ্যুতি, মনে হয় অন্তরীক্ষের বক্ষ হতে একটি জ্যোতির্ময় কৌতূহল ভূতলে এসে বনবীথিকার দীপচম্পক ও নীলাশোকে ছায়া নিবিড় স্নিগ্ধতার বক্ষ অন্বেষণ করছে।

যাই হোক কাব্যের স্থান এটি নয়। আমি আমার মূল বক্তব্য কেন বইটি লিখেছি সে কৈফিয়তই তুলে ধরছি। বেশ কিছুকাল আগে—আমার 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরে একদিন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণামূলক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার বন্ধুবর ডঃ অসীমানন্দ গোবিন্দদাসের সঙ্গে দেখা। আমি বন্ধুবরকে কফি খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালুম কলকাতার কফি হাউসে। ডঃ দাস কিছুটা ইতস্ততঃ করার পর আমাকে বললেন আপনার লেখা প্রাচীন ভারতে গণিত চর্চা কিনেছি ও কিনিয়েছি কিন্তু জীবনে এমন নিরাশ হয়নি। আপনার কাছে যখন গণিতের ইতিহাস শুনতাম তখন সেগুলি কত উজ্জ্বল ও সুন্দর ছিল। ভেবেছিলাম এসবের প্রতিবিম্ব আপনার গ্রন্থে পড়েছে। কিন্তু সে সব কিছুই দেখলাম না। শুধু দেখলাম তথ্য, তত্ত্ব ও শ্লোকের আধিক্যে ভারাক্রান্ত। এতে আমি কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়েছি। আমার প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা লেখার উদ্দেশ্য তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। বলেছি বইখানি কঠিন ও আপোষহীন। বইখানা অধিকাংশ পড়বার জন্য নয় কেবল তথ্য

পর্যালোচনা করবার জন্য। অবশেষে তাঁকে বললাম এবার এমন একখানি বই লিখবো, যেটি আপনাকে খুশী করবে। এবং এরপর থেকেই গণিত জগৎ, গণিৎ বার্তা, বাংলা একাডমী বিজ্ঞান পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায় গণিতের দুরূহ তত্ত্ব আলোচনা না করে গণিতের দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখলাম। আমার প্রবন্ধগুলিতে অল্ডাস হাক্সলে, মরিস ক্লাইন, জে বি. এস. হল্ডেন, পি. আর. হালমোস প্রমুখদের প্রভাব বেশ রয়েছে। এই গ্রন্থের অনেক জায়গায় একাধিক বিরোধী চিন্তাধারার সূক্ষ্মজাল বিস্তার করা হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যায় বিরোধী মতেরও প্রয়োজন আছে। পরবর্তীকালে কোন লেখক এ থেকে কোন সূত্র খোঁজ করে আরও সুন্দর অথচ সুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করতে পারেন। গ্রন্থটিকে চেয়েছিলাম সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তায় পরিপূর্ণ হোক। কিন্তু পাঠক হয়তো আমার লেখা প্রাচীন ভারতে গণিত চর্চার মত রসহীন বই বলে মনে করতে পারেন। যাঁরা সাহিত্যের ভক্ত বা পাঠক তাঁদের কাছে সাহিত্য ও গণিত অংশটি ভাল লাগতে পারে। হয়তো এ নিয়ে গবেষণা করলে পাঠক অনেক কিছু তথ্য আহরণ করতে পারবেন। গণিত ও সৌন্দর্য নিয়ে একটি অংশ সংযোজন করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আয়তনবৃদ্ধি পাবে বলে সে আশাকে দমন করতে হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশে আমাকে যাঁরা সর্বাগ্রে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন রাজ্য পুস্তক পর্ষদের কর্ণধার অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা, ডঃ মনীন্দ্র চন্দ্র চাকী, ডঃ বি. কে. লাহিড়ী, অধ্যাপক অরূপ রতন ভট্টাচার্য, শ্রীসমীরণ সাহা, শ্রীসুখদা প্রসাদ মজুমদার, শ্রীপ্রণব কুমার মজুমদার, ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতি সন্ধ্যা মজুমদার, শ্রীসুরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ। তাছাড়া নৈহাটী কলেজের অধ্যাপক নরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, ডঃ অরূপ কুমার মিত্র ও অধ্যাপক পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় নানারকম উপদেশ দিয়ে সাহার্য্য করেছেন। এদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার দাদামশাই ৺যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যাভূষণ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, স্মৃতিশাস্ত্রী ছোট বেলায় আমার মনে যে দার্শনিক চিন্তাধারা গেঁথে দিয়েছিলেন তার জন্যই বইটি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং এজন্য দাদামশাই এর কাছে ঋণী।

প্রুফ দেখার কাজে সহায়তা করেছে শ্রীবুদ্ধদেব চক্রবর্তী, শ্রীগোপাল চক্রবর্তী, শ্রীবিনয় সরকার ও শ্রীমধু ঘোষ। মাত্র একমাসের মধ্যে পাইওনীয়ার প্রিন্টিং

ওয়ার্কস বইটি ছেপে দেওয়ার ফলে এত তাড়াতাড়ি বইটি প্রকাশ পেল। এজন্য এই প্রেসের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাছাড়া রাজ্যপুস্তক পর্ষদের কর্মচারীবৃন্দ যেভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন তার জন্য বলা যায়—এঁদের মতো নিষ্ঠাবান কর্মচারী যে কোন সরকারের গর্বের বিষয়।

বইটির মধ্যে 'মূলায়ন' এবং 'ধরনের' এই দুটি বানানের ক্ষেত্রে মূল্যায়ণ এবং ধরণের এই দুটি বানান ব্যবহার করেছি। ভাষার ক্ষেত্রে হয়তো কয়েকটি জায়গায় শ্রুতিকটু হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। সুধী পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই এগুলি ক্ষমার চক্ষে দেখবেন। বইটি পাঠ করে যদি সুধী পাঠকবৃন্দের মনে সামান্যতম জিজ্ঞাসার উদয় হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

পরিশেষে বলি, আমার ভাইঝি পিয়ালী মজুমদার রোজ সকালে 'জ্যেঠু—তোমার লেখা বই কবে দেখবো' বলে যদি তাগাদা না দিত তাহলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি বইটি লেখা সম্ভব হ'ত না।

প্রদীপ কুমার মজুমদার

শিবরাত্রি, 22 শে ফেব্রুয়ারী, 1982,
60, তালপুকুর রোড,
পোঃ নৈহাটী, 24 পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ।

দ্রষ্টব্য: পাঠকদের কৌতূহল যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য আমার রচনায় ক্ষেত্রবিশেষে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করেছি এবং দুই একটি ক্ষেত্রে হঠাৎ অধ্যায় শেষ করেছি।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়— ... পৃঃ ১—১২

গণিতের ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়— ... পৃঃ ১৩—২৯

আমাদের দৃষ্টিতে গণিত

তৃতীয় অধ্যায়— ... পৃঃ ৩০—৩৯

গাণিতিক সৃজন

চতুর্থ অধ্যায়— ... পৃঃ ৪০—৪৯

গাণিতিক চিন্তার সূত্র সন্ধানে

পঞ্চম অধ্যায়— ... পৃঃ ৫০—৫৮

সমাজ ও গণিত

ষষ্ঠ অধ্যায়— ... পৃঃ ৫৯—৭৫

গণিত ও ধর্ম

সপ্তম অধ্যায়— ... পৃঃ ৭৬—১১০

সাহিত্য ও গণিত

অষ্টম অধ্যায়— ... পৃঃ ১১১—১১৪

গণিত ও শিল্প

নবম অধ্যায়— ... পৃঃ ১১৫—১২৫

গাণিতিক চিন্তার মনস্তত্ত্ব

দশম অধ্যায়— ... পৃঃ ১২৬—১৩১

গণিতের সংকট

তত্ত্ব ও তথ্য সমূহের আকর ... পৃঃ ১৩২—১৩৫

প্রথম অধ্যায়

গণিতের ভূমিকা

গাণিতিক চিন্তা আজকাল এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সাধারণ মানুষ এর নাগাল পায় না। ফলে গণিতচর্চা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কৌতূহল কিছুটা অস্তগামী। হয়তো সাধারণ জনমানসে কৌতূহল থেকে যায়—গণিতচর্চা কি সত্যই কোন কাজে আসে? শুধু সাধারণ মানুষ কেন, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেন্ট অগাষ্টিন, ব্লেইজে পাস্কাল, আরথার সোপেনহাওয়ার প্রমুখদের উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। সেন্ট অগাষ্টিন বলেছেন 'ভাল খ্রীষ্টান সর্বদাই গণিতকে পরিহার করে চলবে।' সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত গণিতবিদ ব্লেইজে পাস্কাল বলেছেন 'মননের উৎকৃষ্ট বিভাগই হচ্ছে গণিত। কিন্তু গণিত অপ্রয়োজনীয়'। আরথার সোপেনহাওয়ার বলেছেন 'এই শাস্ত্রে অনেক নোঙরা জিনিষ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হচ্ছে চেতনার হীনতম কর্মই পাটীগণিত।' বলা বাহুল্য এ ধরণের মনোবৃত্তি গণিতের ক্রমবিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—আমরা কেন গণিত শিখবো? এর সঠিক উত্তর হয়তো দেওয়া যাবে না। তবুও বলা যেতে পারে—গণিত ছাড়া এমন কোন বিষয় নেই যা মনকে সর্বতোভাবে সুসমঞ্জস করে রাখে। গণিতচর্চাকারীকে নানাবিধ চমকের সামনে উপস্থিত হোতে হয় কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে ঠিক এভাব দেখা যায় না। মানব মনের চেতনা-সম্ভূত যুক্তিধারার বিশুদ্ধ ও সঠিক প্রয়োগ এবং বুদ্ধিসম্ভূত চিন্তাধারার সাফল্যের ও আস্থার সন্ধান গণিতে পাওয়া যায়। গণিত তার বিষয়বস্তু ও আকারের জন্য রাজকীয় বিজ্ঞানের মর্যাদা পেয়ে থাকে। কারণ তার নিজের মধ্যেই উৎপত্তির কারণসমূহ ও প্রমাণের ধারা নিহিত থাকে। গণিত তার লক্ষ্যে পৌঁছায় তার স্বাধীন চিন্তার বলে অর্থাৎ গাণিতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। এর চেতনা সমস্ত রকম স্ববিরোধী থেকে মুক্ত। গণিতের অন্যতম উপাদানসমূহের মধ্যে এর মান, নিয়ম, সূত্রাদি

ও প্রতীক উল্লেখযোগ্য। গণিত সর্বদাই পূর্বের সংজ্ঞা এবং বর্তমান সংজ্ঞার মধ্যে সাযুজ্য রেখে চলে।

গণিত কেন পড়বো ?· এ সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছেন—"দর্শনের জন্য যে মানসিকতার আবশ্যক তার প্রস্তুতির জন্য গণিত চর্চা করা প্রয়োজন।" প্রখ্যাত গণিতবিদ আইজ্যাক ব্যারো বলেছেন—

The mathematics which effectually exercises, not vainly deludes or vexatiously torments studious minds with obscure subtilties; perplexed difficulties, or contentious disquisitions, which overcomes without opposition, triumphs without pomp, compels without force, and rules absolutely without loss of liberty which does not privately overreach a weak faith, but openly assults an armed reason, obtains a total victory, and puts on inevitable chains; whose words are so many oracles, and works as many miracles; which blabs out nothing rashly, nor designs anything from the purpose, but plainly demonstrates and readily performs all things with in its verge; which obtrude, no false shadow of science, but the very science itself, the mind firmly adheres to it, as soon as possessed of it, and can never after desert it of its own accord, or be deprived of it by any force of others: Lastly the mathematics, which depend upon principles clear to the mind, and agreeable to experience, which draws certain conclusions, instructs by profitable rules, unfold pleasant questions, and produces wonderful effects, which is the fruitful parent of, I had almost said all, arts the unshaken foundation of sciences, and the plentiful fountain of advantage to human affairs. আইজ্যাক ব্যারো অন্যত্র বলেছেন—These disciplines [Mathematics] serve to inure and corroborate the mind to a constant diligence in study; to undergo the trouble of an attentive Meditation, and cheerfully contend with such

difficulties as lie in the way. They wholly deliver us from a credulous simplicity, most strongly fortify us against the vanity of scepticism effectually restrain from a rash presumption, most easily incline us to a due assent, perfectly subject us to the Government of right reason, and inspire us with resolution to wrestle against the unjust tyranny of false prejudices. If the fancy be unstable and fluctuating, it is to be poised by the ballast and steadied by the anchor, if the wit be blunt it is sharpened upon the whetstone ; if luxuriant it is pared by this knife ; if headstrong it is restrained by this bridle ; and if dull it is roused by the spur. The steps are guided by no lamp more clearly through the dark mazes of nature by no thread more surely through the intricate labyrinths of philosophy, nor lastly is the bottom of truth sounded more happily by any other line. I will not mention how plentiful a stock of knowledge the mind is furnished from these, with what wholesome food it is nourished, and what sincere pleasure it enjoys. But if I speek further, I shall neither be the only person, nor the first, who affirms it ; that while the mind is abstracted and elevated from sensible matter, distinctly views pure forms, conceives the beauty of ideas, and investigates the Harmony of proportions ; the manners themselves are sensibly corrected and improved, the affections composed and rectified, the fancy calmed and settled, and the understanding raised and excited to more divine contemplation. All which I might defend by authority, and confirm by the suffrages of the greatest philosophers.

মধ্যযুগে চার্চের পাদরীরা ভাবতেন ধর্মতত্ত্বে যুক্তির জন্য গণিতের প্রয়োজন অথবা বাণিজ্য, শিল্প এবং বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাত্রার জন্য গণিতের প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য সে যুগে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই গণিতের মূল্য দিতেন এবং গণিতকে জনবোধ্য করবার চেষ্টা করতেন। ফলে গণিত কাঠিন্যের আবরণ ভেদ করে সহজ সরলভাবে উন্মেষিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সাধারণ প্রবন্ধের সঙ্গে গণিতের প্রবন্ধ থাকতো এবং অধিকাংশ পাঠক তা পড়তেন। বর্তমানে মানুষ প্রকৃতির নানা খেয়াল উদ্ঘাটনে সচেষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রে গণিতের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা জানতে চান। একথা সত্য আমাদের সভ্যতায় গণিতের ভূমিকা স্বতঃ প্রবৃত্ত নয়। এর মূল অনেক গভীরে এবং অনেক সময় বিশেষজ্ঞরাও এটিকে অনুধাবন করতে পারেন না।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে গণিত কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে গণিতের সংজ্ঞার সঙ্গে অস্পষ্টভাবে সাক্ষাৎ ঘটে। গণিত হচ্ছে বিজ্ঞানের ভাষা এবং এর কাঠামোটি হচ্ছে যুক্তিসম্মত। এটি হচ্ছে সংখ্যা, দেশ (space) এবং নানাবিধ পদ্ধতির সমাবেশ গঠিত যা থেকে উপসংহার টানা যায়। কেউ কেউ বলবেন এটি ভৌত বিশ্বের (physical world) জ্ঞানের নির্যাস। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন 'যথার্থ গণিত শাস্ত্র নিম্নরূপ স্বীকারোক্তিতে পরিপূর্ণ—যদিও এইরূপ একটি বাক্য কোন কিছু সম্বন্ধে সত্য হয় তাহা হইলে এইরূপ অন্য বাক্যও উহা সম্বন্ধে সত্য হইবে। প্রথম বাক্যটি বাস্তবিকই সত্য কিনা অথবা যাহা সম্বন্ধে ইহা সত্য হইবে বলিয়া মনে করা হয় উহা কি—এই সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করা অপরিহার্য নহে। এই উভয় প্রশ্নই ফলিত গণিত শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যথার্থ গণিতশাস্ত্রে (pure mathematics) আমরা অনুমানের (Inference) কোন একটি নিয়ম দ্বারাই আরম্ভ করি এবং উহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যদি এইরূপ একটি বাক্য সত্য হয় তাহা হইলে এইরূপ অন্য একটি বাক্যও সত্য হইবে। আকারগত যুক্তিবিদ্যার নীতি সমূহের অধিকাংশই অনুমানের নিয়ম। অতঃপর আমরা প্রাসঙ্গিক কোন প্রকল্প বাছিয়া লই এবং উহা হইতে সিদ্ধান্ত অনুমান করি। যদি আমাদের প্রকল্পটি এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে না হইয়া অনির্দিষ্ট কোন কিছু সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে আমাদের অনুমান গণিতশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হইবে। অতএব আমরা নিম্নলিখিতভাবে গণিতশাস্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি ঃ ইহা এমন একটি বিষয় যাহাতে আমরা কি সম্বন্ধে আলোচনা করি তাহা জানিনা এবং ইহাও জানি না এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি তাহা সত্য

কি না।' যাই হোক গণিত কি এবং এর ভূমিকাই বা কি তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। গণিতের গুণরাজির মধ্যে যুক্তি অন্যতম। যুক্তিসম্মত বিরুদ্ধতার সীমার মধ্যে গণিত তার সঠিক চিন্তা এমনভাবে নির্বাচন করে যার ফলে সে অচিরেই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে গণিত শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বিচার শক্তির প্রশিক্ষণ করা। গণিত শাস্ত্র পড়লে মানুষের মনে যুক্তির প্রতি বিশ্বাস উদ্দীপিত হয়। অর্থাৎ যে সত্য প্রমাণিত হলো তার উপর নির্ভরশীলতা এবং প্রমাণের প্রতি মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে।

ভোর বেলায় সূর্যোদয়ের পূর্বে আমরা আলো দেখতে পাই। কিন্তু কেন দেখতে পাই? এই কেন'র চেতনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গণিতের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সহ-অবস্থান নীতিতেই গণিত চলে। মাপ (measure), সময় (time), দেশ (space) বল (force), তাপ (temparature) প্রভৃতি উপলব্ধিজাত সম্বন্ধকেই গণিত সংজ্ঞায়িত করে। এটি বিজ্ঞানের একটি দুরূহ বিভাগ এবং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। কিন্তু একবার যে তত্ত্ব বা সূত্র গড়ে ওঠে তা অত্যন্ত যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা হয়। মানুষের মনের ভ্রান্তি ও পরিবর্তনের মধ্যেই এটি অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলছে ও শক্তিশালী হচ্ছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে অধিকাংশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয় পরবর্তীকালে তা ভেঙ্গে খান খান করা হয়। আবার পূর্ববর্তীযুগে যা করতে পারা যায়নি তার পরবর্তীযুগে তা আবিষ্কার করা হয়ে থাকে। কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যেক যুগেই নূতন কিছু করা হয় পুরানো কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। এর সাফল্য সর্বজন-স্বীকৃত অর্থাৎ এর মধ্যে দ্বিধাজড়িত ধারণার স্থান নেই। বিভিন্ন প্রপঞ্চকাদির মধ্যে তুলনা করা এবং এবং এদের মধ্যে গোপনীয় সাদৃশ আবিষ্কার করাই গণিতের অন্যতম কাজ। সঠিক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গণিত শাস্ত্রের অন্যতম মুখ্য বিষয়। যথার্থতা, তীক্ষ্ণতা ও সম্পূর্ণতা গণিতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। কিন্তু গণিতবিদদের কাছে কি করে এই সম্পূর্ণতা ধরা দেবে তা বলা কঠিন। এই সম্পূর্ণতার পিছনে কোন রহস্য ন্যস্ত নেই। যথার্থতার পিছনে হয়তো কোন ধারণা রয়েছে অন্য কিছু নেই। গণিতবিদদের কাজই হচ্ছে এই সমস্ত কিছু নির্ণয়

করা। গাণিতিক চিন্তায় দৃঢ় বিশ্বাস অনেক সময় প্রয়োজন হয়। এবং সেক্ষেত্রে গণিত শুধুমাত্র দৃঢ় বিশ্বাসকেই বহন করে না—যেখানে এই গাণিতিক চিন্তাকে প্রয়োগ করা হয় সেখানে এই দৃঢ় বিশ্বাস স্থানান্তরিত হয়। অনেক সময় ভ্রান্তিজনিত বিরুদ্ধতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিন্তু এটিকে এড়িয়ে চলতে হলে অতি সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভ্রান্তিজনিত সন্দেহও অনেক সময় দেখা যায়। এর কারণ কি? যখন আমরা পুংখানুপুংখভাবে গাণিতিক চিন্তায় রত হই তখন হয়তো স্বচ্ছ চিন্তা নাও থাকতে পারে কারণ হয়তো কোন কিছু আমাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। অনেক সময় অতি দ্রুত চিন্তার জন্য সন্দেহ ও অনিশ্চতার উদ্রেক হয়। প্রশ্ন হচ্ছে এ থেকে কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যায়? অত্যন্ত কঠিন বা দুরূহ প্রমাণের মধ্য দিয়ে কি এর সমাধান পাওয়া যায়? অথবা পুরানো নিয়ম বাতিল করে নূতন নিয়মের প্রবর্তনের মাধ্যমেই কি সমাধান পাওয়া যাবে? যে সন্দেহের অবকাশ আমাদের নজরে আসে মনে হয় গাণিতিক চিন্তার প্রতিটি ধাপে অনিশ্চিয়তার জন্যই ঘটে এবং এই জন্য বাধার সৃষ্টি হয়। গণিতের রাজ্যে একই লক্ষ্যে যেতে গেলে শতাধিক ভিন্ন পথের সাহায্যে যাওয়া যায়, ফলে যিনি যে পথ বেছে নিয়ে এই লক্ষ্যে পৌছান বা পৌছাইতে চেষ্টা করেন তিনি ভাবেন তিনি সঠিক পথের সাহায্যে পৌছেছেন। এ থেকে এটুকু বলা যায় গণিত হচ্ছে বহুর মধ্যে এক যার গঠন প্রকৃতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত কিন্তু একটি লক্ষ্যে উপনীত। তবে গাণিতিক চিন্তায় ন্যায়ের যুক্তি এবং ধারণাসমূহ মিলে একটি সুসমঞ্জস চিন্তায় পর্যবসিত হয় এবং গাণিতিক তত্ত্ব যতই আবিষ্কৃত হচ্ছে, বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে ঐক্যতান সূত্র ততই গড়ে উঠছে।

অনেকেই মনে করেন গণিত চর্চার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রয়োজন নেই এবং কার্যকারণ সম্বন্ধও নাই। বলা বাহুল্য গণিতের ক্ষেত্রে এ মতধারা সুপ্রযুক্ত নয়। কারণ আমরা বলতে পারি প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিশেষ অধিকারই হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করা। গণিতের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই এটা করা প্রয়োজন, না হোলে গাণিতিক তত্ত্ব আমরা দ্রুত আবিষ্কার করতে পারব না। গাণিতিক চিন্তা সর্বদাই নূতন সূত্র, নূতন ধ্যান ধারণা এবং নূতন পদ্ধতিকে আহ্বান করে। সহজাত চিন্তাশক্তি ও মানুষের মনের কর্মধারার মধ্যে গাণিতিক চিন্তা দোদুল্যমান এবং সর্বদাই অগ্নি পরীক্ষার

সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই গাণিতিক চিন্তনে কখনও প্রপঞ্চকাদির হ্রাস ঘটে আবার কখনও বৃদ্ধি ঘটে। অনেক সময় দূর থেকে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে গভীর মনসংযোগ দ্বারা এর বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায় বিরামহীন পর্যবেক্ষণ, তুলনা করা, শ্রেণী বিভাগকরণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মূল অস্ত্র হচ্ছে আরোহ পদ্ধতি এবং এটির জন্য কল্পনা শক্তির পরীক্ষা ও বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। অবশ্য আরোহ পদ্ধতির ফলে যেভাবে ভৌত বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটে ঠিক সেইভাবে গাণিতিক তত্ত্বের বিবর্তন হয়। অনেক সময় আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে গাণিতিক চিন্তায় বহু স্বাধীন ফল (result) পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি একত্রিত করে কোন একটি গাণিতিক মতবাদে পর্যবসিত করা প্রয়োজন।

আবার অনেকে মনে করেন গণিত চর্চার দ্বারা পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ ঘটে না। পর্যবেক্ষণ বলতে মনে করা যেতে পারে কোন ভৌত বা মননজাত বিষয়ের উপর মনোনিবেশ এমন ভাবে করা হয় যাতে এদের স্বাতন্ত্র, সাদৃশ্য, পার্থক্য ও অন্যান্য সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। শিশুরা যখন মানসিক চিন্তার আশ্রয় নেয় তখন এক এবং বহুর মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারে। তারপর এক এবং দুই, দুই এবং তিন প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য তাদের চেতনায় ধরা পড়ে। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় প্রাথমিক গাণিতিক চেতনা থেকেই ধীরে ধীরে গাণিতিক ধারণার ক্রমবিকাশ ঘটছে। জ্যামিতির নানা ধারণাও ঠিক এই ধরণের বিশুদ্ধ মনন সম্ভূত ধারণার অনুশীলন। একটি সরলরেখা ও একটি বক্ররেখার (curve) মধ্যে পার্থক্য কোথায় বা একটি ত্রিভুজ ও বিভিন্ন বক্ররেখার মধ্যে পার্থক্য কোথায় এ প্রশ্ন মনে অহরহ ঘোরা ফেরা করে। এগুলি কি শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণসম্ভূত ধারণা না অন্যকিছু। একথা সত্য যে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের ফলে এই ধারণাগুলি গড়ে ওঠেনি এর মধ্যে উপলব্ধিজাত জ্ঞানও আছে। কারণ এগুলি চোখে দেখার আগে হয়তো মননজাত ধারণা গড়ে ওঠে। অবশ্য আমরা জানি গণিতের ক্ষেত্রে স্মৃতি একটি মূল অঙ্গ এবং এটিকে কোন ক্রমে অবহেলা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমরা যখন গণনা করি বা নামতা মুখস্থ করি তখন স্মৃতিশক্তি মূল অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। স্বভাবতই বলা যায় গাণিতিক চিন্তায় সৃজন করতে গেলে কল্পনাকে মননের সাহায্যে অনুশীলন করতে হয়। এই কল্পনা সর্বদাই ন্যায়জাত

(logical) নয়। অবশ্য গণিতে এমন অনেক চিন্তাধারা আছে যেখানে ন্যায়ের প্রাধান্যই বেশী। গাণিতিক সত্য অনুসন্ধান করতে গেলে কল্পনা স্বভাবতই প্রকল্পকে (hypothesis) জন্ম দেয় এবং পর্যবেক্ষণ ঘটনার (fact) জন্ম দেয়। তবে গণিতের চিন্তাশীল উক্তি সর্বদাই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। গণিতে যে সব প্রতিপাদন আমাদের মনে দৃঢ়তা আনে তা অবশ্যই অনুমান বা কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যখন আমরা দেখি এই অনুমান নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে তখন এই প্রতিপাদন সিদ্ধান্তের দিকে মোড় নেয়।

আদিকাল থেকে মানুষের কৌতূহল প্রকৃতির রহস্য ভেদে। মানুষ জানতে চায় বিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হলো। বিশ্বের আয়তনই বা কি? বলা বাহুল্য মানুষ এসব প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণভাবে পায়নি। যা পেয়েছে তা আংশিকভাবে এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সহযোগিতা করে গণিত বিশ্বরহস্যের সন্ধানে নিয়োজিত। অর্থাৎ প্রকৃতি এবং বিশ্ব রহস্যের সন্ধান করতে গেলে গণিত হচ্ছে চাবিকাঠি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ভৌত সূত্রাদি গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে অর্থাৎ প্রকৃতির রহস্য সন্ধানে গণিতিক তত্ত্বের সাহায্য লওয়া অপরিহার্য। বড় বড় বাঁধ, সেতু, স্টেডিয়াম প্রভৃতি নির্মাণ কার্যে গণিতের সহযোগিতা দেখে কখনই মনে করা উচিত নয় যে পার্থিব মানদণ্ডে বিচার করতে গিয়ে মানুষ তার অন্তর্দৃষ্টি কিছুটা হারিয়ে ফেলছে। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের গভীরে প্রবেশ করার অর্থই হচ্ছে প্রকৃতির পথ কি তা উপলব্ধি করা এবং এজন্য বুদ্ধিজাত কৌতূহল অন্যতম প্রধান বিষয়। প্রকৃতির অনেক রহস্যই গাণিতিক বিচার শক্তির সাহায্যে আমাদের নিকট উন্মোচিত হয়। অর্থাৎ গাণিতিক বিচার শক্তি একটি ফলোৎপাদক পদ্ধতি। সাধারণভাবে বলতে গেলে দাঁড়ায় অন্যান্য বিষয়ে যেভাবে বিচার শক্তির প্রয়োগ করা হয় গণিতের ক্ষেত্রে ঐ একই ধরণের বিচার শক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে যা একান্ত প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে গভীর মনসংযোগ এবং এরই ফলে হয়তো ন্যায়জাত অনুক্রম, সুসংবদ্ধতা এবং সুসমঞ্জস ধারণার স্বাতন্ত্রভাব গড়ে ওঠে।

যদি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে সহজেই বলা যায় গণিত কোন একটি বিশেষ যুগে গড়ে ওঠেনি। যুগে যুগে এটির ক্রমবিকাশ ঘটেছে। গণিত শুধুমাত্র প্রকৃতি বিজ্ঞানের উন্নতিতেই সাহায্য

করেনি পরন্তু ন্যায়বিদ ও দার্শনিকদের বিমূর্ত চিন্তাধারার অন্বেষণে সাহায্য করেছে। ফলে অনেক সময় গণিতের নূতন ধারণা অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা থেকে সরে যায়। যদিও পূর্ণ সংখ্যা, মূলদ সংখ্যা, অমূলদ সংখ্যা, কাল্পনিক রাশি প্রভৃতির ধারণা অভিজ্ঞতা থেকে বিমূর্ত ধারণায় ধাবিত তবুও এমন অনেক গাণিতিক ধারণা আছে যা মননের সাহায্যে উদ্ভূত। যেমন অধিবৃত্ত, উপবৃত্ত প্রভৃতির ধারণা কিছুটা মননসম্ভূত। গাণিতিক চিন্তা যত বেশী বিকাশ লাভ করছে ততবেশী অভিজ্ঞতাপ্রসূত :গাণিতিক ধারণা থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে এবং আরও বেশী মানব মনের গহন তল থেকে উত্থিত হচ্ছে। তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাসম্ভূত গাণিতিক ধারণার চেয়ে মনন সম্ভূত বিমূর্ত গাণিতিক ধারণা অনেক বেশী উন্নত ও কার্যকরী কিন্তু কিছুটা দুরূহ। তবে অনেকে মনে করেন এই বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তার গতিশীলতা নেই। সুতরাং জীবনের ছন্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। কারণ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে গণিত এগিয়ে আসে এবং যেহেতু এটি বিজ্ঞানের মূল চিন্তা অতএব এই মহৎ চিন্তার মতধারা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবাহিত।

গণিতের ভূমিকার কথা বলতে গেলে গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করতে হয়। গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধজাত তত্ত্বের মধ্যেই গাণিতিক চিন্তাধারার কার্যাবলীর ফল নিহিত থাকে। স্বতঃসিদ্ধপ্রসূত যে গাণিতিক তত্ত্ব তা নূতন জ্ঞানের সন্ধান দেয়। আমরা জানি সংখ্যা সম্বন্ধীয় যে স্বতঃসিদ্ধ তা বীজগণিত ও অপেক্ষকের বিশেষত্ব (properties of function) প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে। অনেক সময় আমাদের গভীর জ্ঞানে অবরোহ বিচার শক্তির ভূমিকাও রয়েছে এবং এই বিচারশক্তিতে স্বতঃসিদ্ধ নির্দিষ্ট কাজ পালন করে চলে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গণিতে কি প্রমাণ করতে হবে এবং কেমনভাবে তা করতে হবে তার জন্য কল্পনা এবং আবিষ্কার অন্যতম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তবে অবরোহ বিচার শক্তি মননশীলতার বিকাশ ঘটায় এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগও লক্ষণীয়।

এ কথা সত্য গণিতের বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে অবরোহ পদ্ধতির সাহায্যে গঠিত। অর্থাৎ গাণিতিক ব্যাখ্যা অনেকক্ষেত্রে অবরোহী। কারণ এটি

সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে রচিত এবং ব্যাখ্যার সঙ্গে সমতা রেখে গঠিত। অবশ্য গণিতের সংজ্ঞার বহির্সত্য প্রতিপাদন করতে হয় না (no external verification of definition is required)। গণিতের ক্ষেত্রে যে অবরোহ পদ্ধতি তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। যদি কেউ অনেকগুলি চতুর্ভুজ নিয়ে প্রত্যেকটি চতুর্ভুজের কোণ সমষ্টি পরিমাপ করেন তাহলে দেখতে পাবেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই চারটি কোণের সমষ্টি চার সমকোণ। এ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারা যায় যে চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি চার সমকোণ। এবং এই যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হোল তা সর্বক্ষেত্রে সঠিক। বলতে দ্বিধা নেই গণিতের ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে ব্যাপ্তিকৃত ফলাফল। তবে এই অবরোহ পদ্ধতির ফলে যে গাণিতিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা বা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় তাতে কখনও কখনও বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বহে যায়। তখন কিন্তু গাণিতিক তত্ত্বটি ঠিক বা বেঠিক তার উপর নির্ভরশীল নয়। যতদূর মনে হয় গণিতে যে প্রমাণ আমরা করতে যাই তার উপর নির্ভরশীল। অথবা যে গাণিতিক উক্তি (Mathematical proposition) প্রতিপাদন করা হয় তার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য গাণিতিক জ্ঞানকে সংঘবদ্ধ করাই হচ্ছে অবরোহ পদ্ধতির অন্যতম ভূমিকা। অবরোহ পদ্ধতির ফলে বলা যায় কোন্ গাণিতিক চিন্তা মূল এবং কোনটি অন্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ অবরোহ পদ্ধতি মানব মনকে পর্যালোচনা করতে সাহায্য করে এবং বহুবিধ উপসংহারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

গণিতের ভূমিকার কথা আলোচনা করতে গিয়ে পর্যবেক্ষণ, অবরোহ পদ্ধতি, স্বতঃসিদ্ধ প্রভৃতি সম্পর্কে কিছু বলা হোলো। এবারে গণিতের পুষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। অর্থাৎ গণিতের ভূমিকার উপর গণিতের পুষ্টি নির্ভর করে বলে এ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। গণিতের কোন শাখা যখন উন্নতমুখী হয় তখন নূতন নূতন গাণিতিক ধারণার বা প্রত্যয়ের প্রবর্তন করা হয় এবং এগুলি বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এথেকে শত সহস্র বিভিন্ন প্রকারের নূতন ধারণা আমাদের মনে জন্মাতে থাকে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও লোভনীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এবং এরই প্রয়োগ পদার্থবিজ্ঞানের উর্জান্নর তত্ত্ব (quantum theory) পারমাণবিকবিদ্যা প্রভৃতি শাখায় দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অবিরত নূতন গাণিতিক ধারণাসমূহের

বা প্রত্যয়াদির প্রবর্তন গাণিতিক চিন্তার পুষ্টি সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন গণিতে যে নূতন নূতন দিক উন্মোচিত হচ্ছে তা কিন্তু বিজ্ঞানের কাছ থেকে প্রাপ্ত নানা সমস্যা সমাধান করতে গিয়েই হচ্ছে। অর্থাৎ গণিতের পুষ্টি সাধনে যে ত্বরণ দেখা যাচ্ছে তা বিজ্ঞানে যেসব নূতন স্বতঃসিদ্ধের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তারই কাছে ঋণী।

গণিতের পুষ্টি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু গণিতবিদরা এবং বিজ্ঞানীরা এগুলি কি ভাবে কাজে লাগাবেন তা ভেবেই অস্থির। অর্থাৎ বলা যেতে পারে গণিতবিদ তথা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটিকে আবিষ্কার বনাম সৃষ্টির দ্বন্দ্ব বা মধুর সম্পর্ক বলা যেতে পারে। তবে বর্তমানে গণিত বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাছাড়া বিভিন্ন কলা (Arts) বিষয়েও এর একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

গণিতের ক্ষেত্রে গাণিতিক আবিষ্কারের ভূমিকা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলাম। কিন্তু একথা আমরা সহজেই বলতে পারি গণিত ও গাণিতিক পদ্ধতির একটা সীমারেখা আছে। অর্থাৎ এমন অনেক জ্ঞান আছে যা গণিতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না বা এখনও পর্যন্ত সেগুলি জানতে গেলে কিভাবে গণিতের প্রয়োগ করবো তা আমাদের জানা নেই। ভৌত বিশ্ব এবং মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা এখনও পর্যন্ত অনেক কিছু জানি না। স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ চেতনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। কারণ এগুলি গণিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা এখনো পর্যন্ত প্রায় দুঃসাধ্য। অনেক সময় আবেগ ও অন্যান্য মানবিক বৈশিষ্ট্য গণিতের সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ করা খুব বেশী সম্ভব হয় না। তবে আজকাল অনেক কিছুরই পরিসংখ্যানগত বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। পার্থিব ধারণার এমন বৈশিষ্ট্যও আছে যা গণিতবিদরা উন্মোচিত করতে পারে না। অবশ্য গণিতবিদেরা বলবেন এমন অনেক কিছু আছে যা তাঁদের ধ্যান ধারণার বাইরে পড়ে সুতরাং তাঁরা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। গণিতবিদদের এই সবিনয় প্রত্যাখ্যান আমাদের মনে করিয়ে দেয় সব কিছুকে গাণিতিক প্রথায় চিন্তা করারও একটি সীমারেখা আছে। মানুষ কখনও সীমিত, কখনও কৃত্রিম ধারণা প্রবর্তন করে ভৌত বিশ্বের নানা তথ্য উন্মোচিত করে এবং কখনও পারস্পারিক সম্বন্ধ দেখায়।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা যত উন্নত হচ্ছে ততই গাণিতিক চিন্তা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সব দেখে শুনে মনে হয় মানুষের বিচরণশীল এবং যুক্তিবাদী মনন থেকে গণিতের উৎপত্তি। অর্থাৎ মানুষের মূল সৃষ্টিই হচ্ছে গণিত। মানব সৃষ্ট গণিত হয়তো কার্যকারী যন্ত্রবিশেষ, অন্যকিছু নয়। যদিও সম্পূর্ণরূপে মানব সৃষ্ট তবুও অনেক সময় আশাতীতভাবে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করে। এ সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথাই মনে পড়ে তা হচ্ছে—হয়তো বস্তুগত অস্তিত্বের প্রলোভন হেতু গণিতকে সার্বিকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের দৃষ্টিতে গণিত

যদি কাউকে প্রশ্ন করা যায়—"আপনি গণিত বলতে কি বোঝেন" ? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি নীরব শ্রোতার মতই মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবেন। যদিও বা উত্তর দেবার চেষ্টা করেন হয়তো তা আংশিক অথবা তিনি যেভাবে উত্তর দেবেন তাতে মন ভরবে না। অনেক সময় দেখা যায় গণিত সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি অন্যান্য বৃত্তিধারী যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী প্রভৃতির কথা তুলে ধরছেন এবং অবশেষে বলে উঠবেন তিনি গণিতে এমনই কাঁচা যে ব্যাঙ্কের হিসাব (account) কোনদিনই ঠিক রাখতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে এঁদের ধারণা সংখ্যার সঙ্গে এক বা একাধিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোন কিছু সম্পর্ক স্থির করাই গণিতের মূল কথা। গণিত নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেন তাঁদের মধ্যেও গণিতের সংজ্ঞা সম্পর্কে ভাসা ভাসা (Superficial idea) ধারণা রয়েছে। এঁরা ভাবেন "গণিত হচ্ছে সেই ধরণের বুদ্ধি যা প্রপঞ্চক বিশ্বে লক্ষ্য বস্তুকে সংখ্যার ধারণায় আবদ্ধ রাখে।" বলা বাহুল্য এঁরা গণিতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, কিন্তু কেন করেন তা এঁদের কাছে ততটা স্পষ্ট নয়। সাধারণ লোকের কাছে গণিত শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের সমতুল্য। এঁদের যদি ভারততত্ত্ব বা রক্তের চাপ সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা দেওয়া যায় তাহলে এঁরা এই দুই বিষয়ে কিছু বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হবে এবং এ বিষয়ে তাঁদের মনে একটি ভাবমূর্তি গড়ে উঠবে। কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে কি অজ্ঞ, কি সুশিক্ষিত যাঁকেই প্রশ্ন করা হোক না কেন তিনি গণিতের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গণিতের ধর্ম, তার স্বরূপ বা তার মূল্যায়ণ সম্পর্কে বলবেন অর্থাৎ মূল সংজ্ঞাকে এড়িয়ে যাবেন। বলতে পারা যায় কতকটা নাক ঘুরিয়ে কান দেখানোর মত। গণিতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এ ধরণের বিপত্তি প্রায়শঃ এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ এখনও সঠিকভাবে এবং সর্বসম্মতভাবে গণিতের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। গণিত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Iliad-এর কিছু অংশ মনে পড়ে যাচ্ছে। Iliad-এ বলা হয়েছে—

Small at her birth, but rising every hour
While scarce the skies her horrid (mighty) head can bound
She stalks on earth and shakes the world around.

(Iliad, IV, 442-443, Pope's translation)

কবিতাটিতে গণিতের সংজ্ঞার পরিবর্তে গণিতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই বলা হয়েছে ধরে নিতে পারি। যদি গ্রথণ বা গ্রন্থি এবং পদার্থ বিদ্যায় তাত্ত্বিকীকরণ যা বিশ্বকে প্রসারণ করছে তাকে ব্যাখ্যা করাই গণিতের সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হয় তাহলে গণিত বৈশিষ্ট্যমূলক ও ফলোৎপাদক কিন্তু এ দুটির কোনটিই গণিতের সঠিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই দুটি গণিতের ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এবং ধর্ম কখনই সংজ্ঞা হতে পারে না। তাহলে গণিতের সংজ্ঞা কিভাবে দেওয়া যাবে? গণিতের সংজ্ঞা দিতে গেলে এর মূল উপাদান কি জানা দরকার।

আমরা জানি না গণিত কখন, কোথায় এবং কিভাবে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিল। তবে অনুমান করা যেতে পারে এটি কোন প্রাথমিক ভৌত পর্যবেক্ষণের (Primitive Physical observation) ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। এ কথা ঠিক, অধিকাংশ গাণিতিক ধারণা সর্বদাই বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে আমাদের সম্মুখে হাজির হয় নি, এগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পর্যবেক্ষণের ফলে আমরা পেয়েছি। সংখ্যার সঙ্গে প্রকৃতির একটি আত্মিক সংযোগ রয়েছে। মানব মনে যখন এ বোধ জাগ্রত হল তখনই হয়তো গণিতের উৎপত্তি হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা বিকাশ লাভ করেছে। যেদিন মানুষ ভেড়ার পালে কতগুলি ভেড়া আছে সে সম্পর্কে কৌতূহলী হল এবং তার পর সংখ্যার সংখ্যাত্ব, আকার, গতি ও বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা করতে শিখল তখন মানুষ বিস্মিত হল। কৌতূহলই জানবার দিকে মনোনিবেশ করে। এই কৌতূহলই সেই আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। কৌতূহল বুদ্ধিসম্ভূত, ফলে সংখ্যা, বিভিন্ন আকার, গতি, বিন্যাস এবং ধারণা ও তার ক্রম, বৈশিষ্ট্য ও। বিভিন্ন সম্পর্ক এ সব কিছুই গণিতের মূল উপাদান (raw material)। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাকৃতিক নির্বাচনই গণিতের উৎপত্তি। কিন্তু এ

চিন্তাধারাকে অনেকে আমল দেন না। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনই গণিতের মত বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎপত্তির মূল কথা হওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক-এ কূটতর্কে না গিয়ে এটুকু বলা যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন গাণিতিক চিন্তাধারার উৎপত্তির অন্যতম প্রধান হেতু। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে গাণিতিক চিন্তাধারা তখন থেকেই বিকাশ লাভ করতে থাকে যখন থেকে গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গণিতের গুণ থেকে সরিয়ে পরিমাণের দিকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারের সমগ্রতা থেকে সূক্ষ্ম সংগঠনের দিকে, ইন্দ্রিয়পথে চেতনাগোচর প্রত্যক্ষ আকার থেকে তার দর্শনাতীত ও স্পর্শাতীত ও শুধুমাত্র বিশ্লেষণী বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য অংশগুলির দিকে নিবদ্ধ করা হতে থাকে। গণিতের অধিকাংশ শাখাই সূত্রাশ্রয়ী (nomothetic)। এই শাখাগুলির লক্ষ্য ব্যাখ্যাত্মক সূত্রে উপনীত হওয়া। এই সূত্রগুলি তখনই গ্রহণযোগ্য ও জ্ঞানলাভে সহায় হয়ে ওঠে যখন এই সূত্রগুলির সাহায্য এই আপাতদৃশ্যমানের অন্তরালে যে দর্শনাতীত ও স্পর্শাতীত জগৎ বিরাজমান সেই অদৃষ্ট অস্পষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। এই অদৃষ্ট ও অস্পষ্টগুলি বর্ণনার অতীত। এরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাধারণ আপাতগোচরতা থেকে অনুমান দ্বারা তাদের জ্ঞান সম্ভব। গাণিতিক চিন্তায় যে জগৎ তা আপাতগোচরতার জগৎ নয়। এই জগৎ অনুমানগ্রাহ্য সূক্ষ্ম জগৎ, এ জগৎ অন্যোন্যনিরপেক্ষ ঘটনা আর গুণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ নয়। এ জগৎ বিধিবদ্ধ পরিমিতির জগৎ।

গণিতের প্রতিটি শাখায় অনুমান ও সমন্বয়ের একটি বিশেষ কাঠামো আছে। সংখ্যাতত্ত্বে তথ্যের সমন্বয় এক পদ্ধতিতে করা হয় আর জ্যামিতি শাস্ত্রে তথ্যের সমন্বয় করা হয় অন্য পদ্ধতিতে। গণিতের চরম লক্ষ্য এমন একটা অদ্বৈত (monistic) জ্ঞান লাভ নির্মাণ করা যে জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রয়ে এই জগতের অতিব্যাপ্ত বৈচিত্র বিশেষ এক ঐক্যে সরলীকৃত হয়ে আসবে আর অন্যান্য নিরপেক্ষ ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সুসজ্জিত হয়ে এবং সবল হয়ে একটি মাত্র শৃঙ্খলার মধ্যে বিধৃত হতে পারবে। এই লক্ষ্যে গণিত কোনদিন উপনীত হতে পারবে কিনা ভবিষ্যৎই বলতে পারে। এই অবস্থা যতদিন না আসবে ততদিন গণিতের প্রত্যেক শাখার নিজস্ব একটি নিয়ন্ত্রক ধারণা সমষ্টি থাকবে এবং থাকবে তার নিজস্ব পদ্ধতি।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে গণিতশাস্ত্রের নামকরণ এবং ধারণা সম্বন্ধে পদ্ধতিগত

ভাবে কারা প্রথম চিন্তা করে? এর উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে এ ব্যাপারে গ্রীকদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রীকেরা গণিতের নামকরণ, ধারনা ও self reflextion সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাদের চিন্তার মধ্যে সবচেয়ে যেটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে গণিতের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা এবং তাঁরা এ সম্পর্কে ব্যাপক অথচ সুপরিকল্পিতভাবে চিন্তা করতেন। তবে এ সম্পর্কে তাঁরা কতটা সাফল্য লাভ করেছেন তা বলা কঠিন। গণিতের সাধারণ সত্তা সম্বন্ধে হেরোডোটাসের (580B.C—425B.C) জ্ঞান ততটা পরিষ্কার ছিলনা। এ্যারিস্টটল (384—322B.C) গণিত সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন ('Mathematics for the mathematics sake and its oneness.' বলা বাহুল্য এ্যারিস্টটল গণিত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গণিতের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অর্থাৎ গণিত বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে কিছু না বলে অন্যদিকে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে গ্রীকেরা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে দুটি ধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। এ দুটি ধারার প্রথমটি হচ্ছে তত্ত্ববিদ্যা (ontology) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে গণিত। এ্যারিস্টটলের লজিক এই দুই ধারার মধ্যবর্তী। গণিত ফলপ্রসূ প্রণালী হিসাবে অধিবিদ্যাকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছে। কিন্তু যে যাই বলুন না কেন Ens and Logos এর মত গণিত ততটা জোরালো ও ইতিবাচক (affirmative) নয়। অনেকে বলেন 'Mathematics' এই শব্দটি গ্রীক শব্দজাত। এটির উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে আমরা কয়েকটা সূক্ষ্ম অথচ চিন্তাশ্রয়ী ধারণার সম্মুখীন হচ্ছি। অর্থাৎ কোন কিছু শিখতে বা বুঝতে (something that has been learned or understood) হবে অথবা গ্রহণীয় জ্ঞান হচ্ছে Mathematics; ব্যাকরণগত বা তত্ত্বগত দিক থেকে হয়তো বিচার করলে এ ধরনের চিন্তায় হয়তো কিছু ত্রুটি থাকতে পারে তবে যদি আমরা গণিত বলতে গ্রহণীয় জ্ঞান (acquarable knowledge) অর্থাৎ শিক্ষণীয় জ্ঞান হিসাবে ধরি তাহলে অর্থটা কিছুটা পরিষ্কার হয়। গ্রীকেরা কিন্তু গণিত বলতে ঠিক এই কথাগুলিই বলতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এক কথায় গ্রীকেরা গণিত বলতে শিক্ষার সাহায্যে গ্রহণীয় জ্ঞানকেই বুঝতেন। সংস্কৃত ভাষায় Mathematics 'কে

'গণিত' বলা হয়। গণিত বলতে গণ্ ধাতুর সংগে ত প্রত্যয় যোগে গণিত শব্দটির উৎপত্তি। সুতরাং গণিতের ব্যুৎপত্তিগত সাধারণ অর্থ হলো যা গণনা বা হিসাব করে পাওয়া যায়। তাছাড়া গণ্ ধাতুর আর একটি অর্থ আছে যা সমষ্টি বা সমূহকে বোঝায়। গণতন্ত্র, গণশক্তি প্রভৃতি শব্দগুলি গণ্ ধাতুর এই অর্থেরই প্রকাশক।

অতি ধীরে ধারণার পরিবর্তন হয়। ফলে সাধারণ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত গাণিতিক ধারণাকে প্রকৃত গণিতের বাঁধা ধরা ধারণায় উত্তরণ ঘটাতে সময় লেগেছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে পীথাগোরীয় ভ্রাতৃসংঘদের মাথাতেই প্রথম Mathematics বা সমজাতীয় শব্দের ধারণা আসে। অবশ্য কেউ কেউ আয়োনীয় দার্শনিকদের চিন্তায় এ ধরণের শব্দের উৎস ছিল বলে মত প্রকাশ করবেন কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য সহযোগে এমন কোন প্রামাণিক সূত্র নেই যার ফলে বলা যায় আয়োনীয় দার্শনিকদের চিন্তাধারায় এই শব্দের উৎস ছিল। পীথাগোরীয় ভ্রাতৃসংঘ গণিতকে জীবনের পথ বা চলার পথ (way of life) বলতেন। এঁদের শিক্ষা বা বক্তৃতা শোনার জন্য দুই ধরণের শ্রোতার আগমন ঘটতো। একদল নিয়মিত বক্তৃতা শুনতেন তাঁদের বলা হতো Mathematician এবং অন্য দলকে Incidental member বলা হতো। বলা বাহুল্য Mathematician যাঁদের বলা হতো তাঁরা সর্বদাই যে গণিতে পারদর্শী হবেন এমন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম ছিল না। এ মত বহুদিন ধরেই চলে এসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে আর্কিমিডিসকে পরিপূর্ণভাবে গণিতজ্ঞ বলা হবে। নিউটন শিক্ষায় গণিতবিদ। যদিও অনেকে পদার্থবিদ হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করে থাকেন। রজার বেকন তাঁর শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে ধারণা ছিল তা অগ্রাহ্য করেন এবং তিনি বিজ্ঞানকে গণিতের কাঠামোতে সাজিয়ে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেন। তরুণ দেকার্ত (Descart) অবশ্য Mathesis of universalies এর নামকরণ ও তার কাঠামো সম্পর্কে নূতন কিছু বলেছিলেন। লাইবনিজ এই ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতীকীন্যায়ের (Symbolic logic) ধারণার সূচনা করেন। বিংশ শতাব্দী এই প্রতীকী ন্যায়ই গাণিতিক ন্যায় (Mathematical logic) রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। এ থেকে আমরা বলতে পারি গ্রীকদের চিন্তাশ্রিত সাধারণ জ্ঞান থেকেই Mathematics

শব্দটির মূল উৎস পাওয়া যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই সাধারণ জ্ঞান বলতে কি বোঝা যায়? প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Montucla এই সাধারণ জ্ঞানের দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (ক) গাণিতিক জ্ঞান অন্য যে কোন জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, (খ) এটি অন্য যে কোন জ্ঞান যেমন ছন্দ, বিতর্ক, ব্যাখ্যা ইত্যাদির চেয়ে প্রাচীন। কোন কোন সমালোচক প্রথমটিকে পছন্দ করেন। আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিকে পছন্দ করেন। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই দুটি ব্যাখ্যা একে অপরের পরিপূরক। লাইবনিজ বা দেকার্ত গণিতের ক্ষেত্রে যে চিন্তাধারার প্রবর্তন করবার চেষ্টা করছিলেন তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইমানুয়েল কাণ্ট গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নূতন ধারা প্রবর্তনে সচেষ্ট হন এবং তিনি অবরোহী প্রণালীতে (apriorization) জ্যামিতি ও arithmetic এই দুটি বিষয়কে চিন্তা করতে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীতে জর্জ ক্যাণ্টরের সংহতি তত্ত্ব (set theory) গাণিতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি নূতন তরঙ্গ (wave) এনে দিয়েছিল এবং তারই ফলে বর্তমান গাণিতিক চিন্তাধারা দ্রুত ও অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে চলেছে।

গ্যালিলিও বলেছিলেন "গণিত হচ্ছে বিজ্ঞানের ভাষা এবং প্রকৃতির ব্যাখ্যায় এর প্রয়োজন।" সত্যই এই উক্তিটি অত্যন্ত খাঁটি। আমরা জানি সাহিত্যশিল্পের প্রকাশ-মাধ্যমরূপে যেমন সাধারণ ভাষা অপ্রতুল। বিজ্ঞানের প্রকাশ মাধ্যমরূপে এই ভাষা তেমনই অকিঞ্চিৎকর। এই অপ্রতুলতার জন্যই গণিতের সাহায্যে বিজ্ঞানকে ঠিকভাবে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাষা তার বিশুদ্ধতম অবস্থায় আর কথাশ্রিত ভাষা থাকে না, তা গাণিতিক প্রতীকের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। গণিতবিদের লক্ষ্য হল একটিমাত্র বিষয়কে একবারেই বলা, আর তা দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং সবচেয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলা। অবশ্য একবারে বলার অর্থ এই নয় যে—বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যাবে না। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে গণিতবিদের লক্ষ্য এককালীন একটিমাত্র বিষয়কে প্রকাশ করা। গণিতবিদরা গোষ্ঠীর ভাষাকে পরিশুদ্ধ করে নেন। গণিতের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন অবভাষার (Jargan) মধ্যে বিস্তর প্রভেদ রয়েছে কিন্তু এই অবভাষা নির্মাণের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সর্বক্ষেত্রেই এক। গণিতের বিভিন্ন শাখায় নিয়মিত সরলীকরণের কারণও এক এবং এর

পদ্ধতি এক। এই পদ্ধতির মূলকথা হচ্ছে—গণিতের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত প্রত্যেক বাক্য দ্ব্যর্থহীনভাবে একমাত্র একটি অর্থকেই প্রকাশ করবে।

সাধু বা যোগীর পক্ষে ঈশ্বর মিলনের অনুভব জ্ঞাপন যতটা দুরূহ গণিতবিদের কাছে কোন গাণিতিক চিন্তাকে বা চেতনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা ততটাই দুরূহ। গণিতবিদের প্রথম সমস্যা গাণিতিক চিন্তা বা চেতনাকে কিভাবে উপস্থিত করবেন। গাণিতিক প্রতীকের সাহায্যে না স্বজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞানের সাহায্যে অর্থাৎ দার্শনিক বাগ্মিতায়। ফলে এই গাণিতিক চিন্তা বা চেতনা অনেক সময় মনে আনন্দের শিহরণ জাগায়, আবার কখনও মনের উপর ভার চাপিয়ে দেয়। এই চেতনা বা চিন্তাকে যখন সৃষ্টি করা হয় তখন এটা অবরোহী (deductive) অবস্থায় থাকে না। এই চিন্তনের ক্ষেত্রে গণিতবিদেরা কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় (vague) অনুমান করেন, তারপর এটির ব্যাপ্তিকরণে মনোনিবেশ করেন এবং অবশেষে উপসংহার টানেন। গণিতবিদ তাঁর ধারণাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেন, তারপর স্থূল প্রমাণের পূর্বেই তিনি পাঠক বা শ্রোতাকে নিজের তত্ত্বে বিশ্বাসী করার চেষ্টা (convinced) করেন। গণিতের ক্ষেত্রে এই দৃঢ় বিশ্বাস কখনই দ্রুত বা সহজে জন্মায় না। বহু উদ্যমের পর, বহু ব্যর্থতার পর, বহু ব্যর্থতা ও নিরুৎসাহ এবং ভুল সূচনার পর এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। অনেকসময় দেখা যায় বেশ কিছুকাল হয়ে গেল কোন একটি গাণিতিক ধারণা কোন একটি পদ্ধতিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু সেই পদ্ধতিটি ঠিক নয় সুতরাং পুনরায় নূতন করে ভাবনা চিন্তা, নূতন অনুমান, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নূতন করে উপসংহার ইত্যাদির কথা ভাবতে হয়। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে পুনঃসূত্রীকরণও বাঞ্ছনীয়। বলতে দ্বিধা নেই অনেক সময় যখন এ ধরণের সমস্যার উদ্ভব হয় তখন আরও পরীক্ষামূলকভাবে নানা ভাবনা চিন্তার সমাহারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে এবং ব্যাপ্তিকরণের প্রশ্নও দেখা যায়। গাণিতিক চিন্তায় ব্যাপ্তিকরণ হয় কিভাবে? এর উত্তর সহজে দেওয়া যাবে না। উদাহরণ দিয়ে এ সম্বন্ধে দু চার কথা বলতে চেষ্টা করছি। ধরা যাক কোন গণিতবিদ অসীম মাত্রিক হিলবার্ট দেশে (Infinite dimensional Hilbert space) কোন তত্ত্ব প্রমাণ করতে চান। প্রথমে তিনি নির্দিষ্ট মাত্রিক (finite dimensional) দেশে তত্ত্বটি প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন। তারপর ব্যাপ্তিকরণ অর্থাৎ অসীম

মাত্রিক দেশে তত্ত্বটি প্রমাণে মনোনিবেশ করবেন। তারপর অবরোহ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক কঠিন প্রমাণের দিকে এগোতে থাকবেন। ফলে তাঁর একটি বাস্তব বা প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি ঘটবে। এই অন্তর্দৃষ্টি কিছুটা গাণিতিক সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। এই গাণিতিক সংজ্ঞা অথবা যে কোন গাণিতিক সংজ্ঞা নির্মাণে অনেক দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেওয়া হয়। (বিশেষ করে কোন সংজ্ঞা নির্মাণে যে শব্দ প্রয়োগ করা হয়) প্রত্যেক গাণিতিক সংজ্ঞাই মানসিক রূপরেখা বা আইডিয়া সম্ভূত। কোন গাণিতিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে গেলে আমরা লক্ষ্য করলাম কোন না কোন গাণিতিক সংজ্ঞার সাহায্য নিতে হয়। এক্ষেত্রে ঐ গাণিতিক সংজ্ঞা একটি নূতন অনিশ্চয়তা ও রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক তাৎপর্য অর্জন করে। এবং এই গাণিতিক সংজ্ঞা তখন আর মানসিক রূপরেখা বা আইডিয়া থাকে না। এটি একটি বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয় অর্থাৎ তা প্রহেলিকার মত পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপথে উদিত হয়। কোন একটি বিশেষ গাণিতিক চিন্তাকে বিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করে তাকে স্বীকৃত তত্ত্বের অংশবিশেষ রূপে না ভেবে তাকে তার স্বপ্রকৃতিজাত সংজ্ঞা ও অর্থের একটি স্বয়ংসিদ্ধ সত্তারূপে গ্রহণ করলে যে মানসিকরূপরেখা বা সংজ্ঞা পাওয়া যায় সেই সংজ্ঞা আগামীকালের গণিতের বিশ্বজনীন তত্ত্ব সৃষ্টি করবে। এই তত্ত্ব একাধারে মৌলিক, যুক্তিগ্রাহ্য ও চিন্তার আড়ালে সেই সত্তা যা চিন্তাকে বিধৃত করে তাকে এমন পর্যায়ে এনে ফেলে যা সব কিছুকে প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

গাণিতিক সংবেদ দুর্লভ কারণ গাণিতিক অন্তর্ভাবনার বহিঃপ্রকাশের সামর্থ খুব কম লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের অনেকেই গাউসের (Gauss) মত গাণিতিক চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন কিন্তু সেই নিমগ্নতা তাঁর মতো করে কোন গাণিতিক তত্ত্বের সূত্র সন্ধানে নিমগ্ন থাকে না। গাণিতিক সংজ্ঞার প্রধান লক্ষণ এই যে তা থেকে এমন একটি উপায় বা সত্তা সৃষ্টি করা হয় যার সহায়তায় পূর্ণ পরিণত গাণিতিক তত্ত্বের মূল উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে। কখনও কখনও এই চিন্তন গণিতবিদের লক্ষ্যকেও অতিক্রম.করে যায়। গাণিতিক সত্তা যখন চরম কুহকময়তার স্তরে উত্তীর্ণ হয় তখন তা এমন সংবেদ জাগ্রত করে যার তুলনা যোগারূঢ় অবস্থার অব্যবহিত পূর্বের বা পূর্ণযোগারূঢ় অবস্থায় স্বয়ং আবির্ভূত নিরুপাধিক উপলব্ধি। গাণিতিক তত্ত্বে সংজ্ঞার সামান্য পরিবর্তনে তত্ত্বের প্রমাণে অঙ্গহানি ঘটে। পরিশুদ্ধ

গাণিতিক সংজ্ঞা চিন্তারাজ্যে সাধনমাত্র। এই সংজ্ঞা একটি উপায়মাত্র, যে উপায়কে ব্যবহার করে কোন গাণিতিক সত্তাকে পরিচিত কোন অনুমান কাঠামোর মধ্যে সংবদ্ধ করে অথবা পুরনো কাঠামোর সংগে সংগতিপূর্ণ নূতন কোন অনুমান কাঠামোর মধ্যে সুসজ্জিত একটি বোধগম্য তত্ত্বে উপনীত হওয়া। যখন নূতন নূতন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে কোন বিশেষ গাণিতিক তত্ত্বের উপযোগিতা লুপ্ত হয়ে যাবে তখন ঐ তত্ত্বটি তার পূর্বের এই ধরণের তত্ত্বের মতোই নিরর্থক হয়ে গণিত শাস্ত্রের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে একটি পাদটীকা-রূপে শোভাবর্ধন করবে। বিশেষ কোন গাণিতিক অনুমান কলাপের মধ্যে আবদ্ধ উপায়ধর্মী যে গাণিতিক তত্ত্ব তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অল্পায়ু। তবু এই সব অল্পায়ু সৃষ্টি সংঘবদ্ধ হয়ে, সারিবদ্ধ হয়ে এমন একটি জয়স্তম্ভ নির্মান করছে যা দিল্লীর অশোক স্তম্ভের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী। আত্মলীন ও সার্বজনীন। নাম ও রূপ। ধারণার জগৎ ও প্রত্যক্ষ সংবেদের ভূয়িষ্ঠতা। একদিকে গাণিতিক তত্ত্বে সংজ্ঞাশ্রিত ঋজুতা আর অপরটিকে কুহকময় চিন্তনের শুদ্ধতা। গাণিতিক চিন্তনের এ দুই-এর দ্বন্দ্ব অহরহই লেগে রয়েছে এবং এই দ্বন্দ্বের আশু মীমাংসা সম্ভব কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

গাণিতিক চিন্তাধারা যত বেশী সমৃদ্ধ হচ্ছে, চিন্তার সমাহার তত গড়ে উঠছে এবং বিশ্বজনীন স্বীকৃতও পাচ্ছে। পূর্বসূরীদের সামগ্রিক স্বজ্ঞাকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে ধীরে অতি ধীরে এটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অনেকসময় এই চিন্তাধারা নূতনত্বের সাক্ষর বহন করে। বলা বাহুল্য এই স্বজ্ঞা সর্বদা একই পর্যায়ের নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা অমূলদ রাশির (irrational number) কথা বলতে পারি। অমূলদ রাশি বলতে পূর্বে যে চিন্তাধারা আমাদের মধ্যে ছিল বর্তমানে আর সে চিন্তাধারাকে মেনে নেওয়া চলে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের সমষ্টিগত স্বজ্ঞার অখণ্ডতাই সর্বদা মেনে নিলেই চলবে না সংগে সংগে কিছু বাধাও অতিক্রম করতে হবে। অভিযোজন (adaptaion) এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। টপলজিবিদ (Topologists) যেমন তাঁর চর্চাগত বিমূর্ত (abstract) চিন্তাধারার সংগে অনেকবেশী পরিচিত। তার ফলে তিনি যে সব উদাহরণের সমাবেশ ঘটাবেন সেগুলির অধিকাংশ বাস্তবসম্মত। যেহেতু তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং ধারণা সর্বদাই বাস্তবমুখী। এই ধরণের অনুভূতি গণিতের অধিকাংশ শাখার মধ্যে কখনও প্রচ্ছন্নভাবে আবার কখনও সরাসরি

উপলব্ধি করা যায়। আমরা যখন গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিক দিক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি তখন এর চিত্তাকর্ষীয় ভাবের বিশেষ হেরফের হয় না, অনেক সময় দেখা যায় অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে কোন তত্ত্ব সৃষ্টি করা হয়। বহু তত্ত্বের কাঠামোর একটি সাধারণ উপাদান হিসাবে একে গ্রাহ্য করা যায়। যদি আমরা উপসংহারকে (conclusion) প্রতিজ্ঞা ও প্রকল্প (hypothesis) নির্বাচনের ফলশ্রুতি ভাবি তাহলে আমরা উপলব্ধি করবো একটি হেত্বার্থক পদ্ধতির বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। অবশ্য অনেক সময় এই হেত্বার্থক পদ্ধতি (causal mechanism) অবিচ্ছিন্নরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় আবার কখনও বিচ্ছিন্নরূপে আমাদের নিকট ধরা দেয়। আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগে গণিতের ভিত্তির (foundation of Mathematics) দিকেই গণিতজ্ঞ-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যদিও এ ব্যাপারে অর্থাৎ গণিতের ভিত্তি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন সংক্ষিপ্ত স্বজ্ঞা-প্রসূত ধারণাসমূহের কোন স্থান এ সবের মধ্যে আছে কি না? যদি এ ধরণের ধারণা আদৌ আমাদের মনে এসে থাকে অথবা আমরা চর্চা করে থাকি তবে এটি সাদৃশ্যগত পদ্ধতির জন্যই হয়েছে অর্থাৎ ইতিহাসগত প্রকৃতির আকস্মিক ঘটনার জন্য। এই শতাব্দীর সূচনা থেকে গাণিতিক তত্ত্বের প্রাচুর্য হেতু এটা হতে পারে যার ফলে পূর্বসূরীদের সমষ্টিগত (collection) স্বজ্ঞাসমূহের কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে আমরা কোন একটি নূতন তত্ত্বের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ তত্ত্ব সৃষ্টি করতে পারছি। বলা বাহুল্য এই প্রাচুর্য হয়তো অনেকক্ষেত্রে গাণিতিক তত্ত্বে বিস্তৃতিকরণের জন্য প্রয়োজন। আমরা জানি গাণিতিক সত্য কখনই পরম সত্য নয়। এই সত্যের ভাঙ্গাগড়া অহরহ চলছে। একমাত্র প্রকৃত প্রতিজ্ঞা (proposition) অথবা স্বতঃসিদ্ধই (poastulate) এক্ষেত্রে সত্য। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ কিন্তু লোভাচেভস্কীর জ্যামিতিতে দুই সমকোণের ছোট। এমন অনেক গাণিতিক চিন্তা আছে যেখানে স্বীকার্য দেওয়া আছে অথবা কল্পনা করা হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে যদি কোন তত্ত্বের আকর্ষণ অনুভব করা যায় তা শুধু তত্ত্বের উপসংহারই এই আকর্ষণের হেতু বলে ধরা যেতে পারে। যে গাণিতিক চিন্তায় তত্ত্বট সত্য বলে ধরা হচ্ছে স্বাভাবিক ভাবেই সীমিত প্রকল্প সহ একটি অবরোহ পদ্ধতির প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অবিচলের

ধারণা (idea of invariance) আশ্চর্যজনকভাবে সংক্ষিপ্ত। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকারণ সমস্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় সেইসব ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রয়োজনীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যদি প্রকল্পকে (hypothesis) স্বাধীন চলরাশি (independent variable) এবং উপসংহারকে (conclusion) এই চলরাশির অপেক্ষক বলে মেনে নিই তাহলে এই অপেক্ষকের বিচ্ছিন্নতা (discontinuity) সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন। সুতরাং একটি সম্বন্ধ স্থির করার পর এবং কোন লক্ষ্য বিবেচনা করার পর বলা যায় গণিত তার নিজস্ব প্রকৃতিতে উদ্ভাসিত। বলা বাহুল্য প্রসঙ্গ (theme), কাঠামো ইত্যাদি তার ধারণার মধ্যে আনবার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ logic এর ধারণা ক্রমে ক্রমে অনুপ্রবেশ করে।

আপাতদৃষ্টিতে গণিতকে মনে হয় "হেতুর বহু ধারায় আবদ্ধ"। প্রতিটি গাণিতিক তত্ত্বই হচ্ছে কিছু প্রতিজ্ঞার সমাহার এবং logic-এর সংমিশ্রণে পূর্বের কোন তত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে এগুলো চিন্তা করা হয়। অর্থাৎ যাকে অবরোহী হেতুবাদ বলা যায় এবং যা গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে একত্রীকরণের মূল কথা হিসাবে ধরা যায়।

গণিতের ব্যাপকত্ব এত বেশী যে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা খুবই কঠিন। সারা বিশ্বে গণিতের উপর এত বেশী প্রবন্ধ প্রকাশ হচ্ছে যার ফলে বিশেষ একজন গণিতজ্ঞের পক্ষে এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা অথবা সমস্ত প্রবন্ধের মূল সারাংশ অধিগত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং সে ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞলোকের কাছে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার অর্থই কিছুটা ফাঁকি দেওয়া। যাই হোক স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায়—এই যে গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাচুর্য্য তা কি যান্ত্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে আগ্রহের এবং প্রতিদিন সংশক্তি ও একাত্মতার ফলে উদ্ভূত? অথবা এই গাণিতিক চিন্তাকে কি গণিতের স্বভাবদোষে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলা হয়? এ কথার উত্তর ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল। আমরা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবো যে গণিত তার নিজস্ব ভাবধারা এবং স্বতন্ত্রীকরণ হেতু অন্য চিন্তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই শতাব্দীর প্রাকালে দেখা গেল গণিত এমন একটি বিজ্ঞান যার একটিমাত্র লক্ষ্য স্থির হলো এবং অন্যান্য পদ্ধতিও স্বীকৃতি পেল। বিশেষ ধারণা এবং পূর্ব থেকে চাপিয়ে

দেওয়ার সীমানার মধ্যেই বিভিন্ন শাখাতেও বিস্তার লাভ করতে থাকে। মনে হয় চিন্তার ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের গোলযোগ থাকার জন্যই এগুলি সম্ভবপর হয়েছে। যদিও বিভিন্ন শাখার ক্ষেত্রে একীভূত করা এবং একটি সংক্ষিপ্ত কেন্দ্রীভূত বিস্তার থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে আমরা ভাবতে আরম্ভ করেছি যে গাণিতিক চিন্তার মধ্যে আন্তর্বিবর্তনের অস্তিত্ব রয়েছে। এবং বিবর্তনের নির্যাস হচ্ছে বিভিন্ন গাণিতিক তত্ত্বের মধ্যে একটি প্রণালীবদ্ধতায় সংযুক্ত রাখা। বলা বাহুল্য এক কথায় একে axiomatic method বলে ধরা যেতে পারে।

পীথাগোরাস যখন তাঁর নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন, ধরা যেতে পারে তখন থেকেই মানুষ যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে শুরু করে। গণিতের উৎস সন্ধান করতে গেলেই আমাদের মনে হয়—হয়তো নক্ষত্রযুক্ত আকাশে দৃষ্টিপাত করতে গিয়েই কোন সুদূর অতীতে মানব মনে সংখ্যা এবং বিভিন্ন জ্যামিতির ধারণার উদয় হয়েছিল। যে বিষয়টি আমাদের মনকে নাড়া দেয় তা হচ্ছে গণিতের বাস্তব দিকটি। বলা যেতে পারে বস্তুর সঙ্গে সংখ্যার বা আকারের অচ্ছেদ্যতা। যেমন একটি ত্রিভুজের অস্তিত্ব বাস্তবসম্মত। ঠিক অনুরূপ ভাবে সংখ্যার ক্ষেত্রেও একই কথা মনে করতে সংশয় জাগে না। উভয়েরই কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত উপস্থাপনা এমনভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় যা মনের বাইরে এবং এগুলি সূত্রের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। বহু সহস্র বছর ধরে গণিত একটি অনুমানভিত্তিক আর্ট (art) ছিল। তারপর ধীরে ধীরে এ ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে। অনেকেই মনে করেন গ্রীকেরা গাণিতিক প্রমাণ আবিষ্কার করেছিল। গ্রীকদের মধ্যে যাঁরা এ সম্মানের অধিকারী তাঁদের আমরা আলোচনার মধ্যে টেনে আনতে চাই না। প্রথম মানুষটি যখন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজটি দেখলেন তখন তিনি কি দেখলেন তার পরিবর্তে এই ত্রিভূজটির বৈশিষ্ট্য কি তা লক্ষ্য করলেন এবং চিন্তার সাহায্যে ও অবরোহী প্রণালীর সাহায্যে এই লক্ষ্য করার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেন। অর্থাৎ গাণিতিক প্রমাণের দিকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গাণিতিক প্রমাণ এমন একটি ধারণা যা বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী, বস্তু থেকে চেতনায়, দুর্জ্ঞেয়ত্ব থেকে যুক্তিরাজ্যে প্রবেশ করতে মূল চিন্তার বা নামের পরিবর্তন করতে হয় না। এই ধারণা মনের কাছে আংশিকভাবে, বুদ্ধিজাত

মূল্যায়ণের কাছে এবং নিজের কাছে আংশিকভাবে বাধ্য বাধকতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। গাণিতিক প্রমাণের মূল কথাই হচ্ছে একটি অবরোহী প্রণালীর সমাবেশ ঘটানো। অবরোহী প্রণালী বলতে আমরা এক্ষেত্রে বুঝি আমাদের উপস্থাপনা কিভাবে অগ্রসর হবে—নীতি থেকে নাকি কারণ থেকে সিদ্ধান্তে অথবা ফল থেকে? এই যুক্তি হয়তো অনেকের কাছে বিসদৃশ লাগতে পারে। এঁদের কাছে গাণিতিক প্রমাণ অবরোহী প্রণালীজাত নয়। বিশেষ করে এই প্রণালী যখন বিশ্লেষণধর্মী হয়। এ ধারণাকে মন থেকে আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি না। কারণ এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ধারণার সমাবেশে উদ্ভূত। এই মতের সমর্থনে উদাহরণও বিস্তর রয়েছে। যেমন বীজগণিতের কথা ধরা যেতে পারে। একটি সমীকরণ দেওয়া থাকলে আমরা এটিকে উপসংহার হিসাবে বিবেচনা করবো। এবং এ থেকে অজ্ঞাত রাশির মান নির্ণয় করার অর্থই হচ্ছে মূলে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ যেটা এক্ষেত্রে নীতির সমর্থক হচ্ছে। কাণ্ট বলেছেন অবরোহী প্রণালী হচ্ছে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ (independence of experience)। অবরোহী প্রণালী অনুমানজনক বা পরীক্ষামূলক নয়। অতএব অবরোহী প্রণালী সম্পর্কে আমাদের মনে কিছু নঞর্থক ধারণা উঁকি দেয়। যদি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়জাত (Passive) ভাসা ভাসা অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তাকে অবরোহী প্রণালী বর্জন করে চলে তাহলে মনে হয় এর মূল্যায়ণ অন্য কোথাও বাঁধা রয়েছে। হয়তো মনের গভীরে। সোজা কথায় বলা যায় অবরোহী প্রণালীর অর্থই হচ্ছে অদৃষ্টবাদ বা হেতুবাদ (By virtue of determinism or for a reason)। মনে হয় অবরোহী প্রণালী কিছুটা বুদ্ধিজাত চিন্তা। এ চিন্তা কি ধরণের বুদ্ধিজাত সেটা নির্ভর করবে মানসিক প্রস্তুতির উপর। গণিত ছাড়া অন্য কোথাও বুদ্ধির মডেল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে মন কিন্তু চিন্তাকে শুদ্ধ করছে না। এবং প্রথমে যা চিন্তা করতে আরম্ভ করা হয়েছিল তাতেই সে বিশ্বস্ত অর্থাৎ আমরা যাকে identity বলছি। তাহলে এক্ষেত্রে বুদ্ধিজাত বলতে identical-এর কথাই ধরবো অর্থাৎ চিন্তায় সর্বোচ্চ দিক হচ্ছে tautology নীতি। মনে হয় এই ধরণের মনোবৃত্তি চিন্তাকে দমিয়ে দেয়। যাই হোক এ সম্পর্কে আলোচনা বিশেষজ্ঞদের জন্য তুলে রেখে আমরা গাণিতিক কারণসমূহ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করছি।

গাণিতিক কারণসমূহ অন্যান্য কারণসমূহের চেয়ে পৃথক। তার কারণ এর আবেদন সর্বজনীন (Universal)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বর্গক্ষেত্র যা সর্বাবস্থায় বর্গক্ষেত্র বলেই প্রতিপন্ন হবে। গাণিতিক কারণসমূহ অহরহই সম্প্রসারিত হচ্ছে (amplification)। বলা বাহুল্য গণিতজ্ঞরা বহু পূর্ব থেকেই সম্প্রসারণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে বহু গণিতিক সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অনেক সময় সংক্ষিপ্তভাবে গণিতিক ধারণা কখনই কোন গণিতিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে না। এর ধারণা বিস্তৃত ও বুদ্ধিজাত। অর্থাৎ কার্যকারীতার ক্ষেত্রে যে বুদ্ধি তাই এক্ষেত্রে সম্পর্ক বলে ধরা হয়। গণিতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বুদ্ধিজাত সমস্যাকে নিয়ে আলোচনা করা। এবং একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই বুদ্ধির উন্মেষ হয়। অবশ্য বলা যেতে পারে অনেকসময় নির্দিষ্ট প্রবণতাই (Bias) কোন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে।

আমাদের আলোচনা হয়ত কিছুটা দিকৃভ্রান্ত। যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা না বলে অনেককিছু অসংলগ্ন, অপ্রয়োজনীয় কিন্তু শুনতে ভাল লাগে এমন কথা বলা হয়েছে। এবং অনেকক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে স্ববিরোধী কিছু কথার অবতারণা করা হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে গণিতের প্রকৃত অন্তর্নিহিত ধারণা গঠন কিরূপ ? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি আধুনিক কালে গণিতের অন্তর্নিহিত ধারণা গঠনের জন্য তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই তিনটী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বৃহত্তর ন্যায় ও গণিত (logistic), আকারনিষ্টবাদ (formalistics) ও স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism).

Logistic দৃষ্টিভঙ্গিতে গণিতকে ন্যায়ের অংশ বিশেষ রূপে ধরা হয়। ন্যায়ের মূল প্রকল্পসমূহকে (hypothesis) ভিত্তি করে প্রতীকী ন্যায়কে (symbolic Logic) এমনভাবে সম্প্রসারণ করা যায় যার ফলে গণিতের সমস্ত যুক্তি ও প্রণালী এই প্রতীকী ন্যায়ের দ্বারা বিধিবদ্ধ করা সম্ভব। যেটিকে এইরূপ প্রতীকীন্যায়ের বিধিবদ্ধরূপে প্রকাশ করা যায় এবং প্রমাণ করা যায় সেটিই হচ্ছে গণিত। p এবং q এই দুটি উক্তি বা প্রতিজ্ঞা (proposition) যাদের মধ্যে এক বা একাধিক চলক বর্তমান এবং p ও q দুটির মধ্যে একই ধরণের উক্তি রয়েছে কিন্তু ন্যায়জাত ধ্রুবক ব্যতীত অন্য কোন ধ্রুবক থাকবে না। এখন p যদি qকে অর্থবহ করে তোলে তাহলে এ ধরণের অর্থবহ চিন্তাই

হচ্ছে বিশুদ্ধ গণিত। বলা বাহুল্য ন্যায়জাত ধ্রুবক বলতে বিজড়িতকরণ, যে কোন পদের সংগে (এটির অস্তিত্ব যেখানে) সেই শ্রেণীর সংগে সম্পর্ক, such that, এটির ধারণা, ইত্যাদিকে বুঝি। সমস্ত গণিতিক ধারণা যেমন সংখ্যা অবকল গুণাংক (differential co-efficient) ইত্যাদি সবকিছুকে ন্যায় ভিত্তিক (logical concept) সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং এদিক থেকে বিচার করলে বিশুদ্ধগণিত ন্যায় (logic) ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আকারনিষ্ঠবাদে দেখা যায় এঁরা অর্থাৎ আকারনিষ্ঠবাদীরা গাণিতিক ধারণা ন্যায়ভিত্তিক ধারণাতে রূপান্তরিত হয় একথা বিশ্বাস করেন না। দর্শনজাত যে ন্যায় তা অনেক সময় গাণিতিক ধারণাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কতকগুলি বিষয়বস্তুর কাঠামোজাত বিজ্ঞানই হচ্ছে গণিত। সংখ্যার ধারণা ঠিক এ ধরণের কাঠামোজাত বৈশিষ্ট্যের একটি সরল প্রতিফলন। এবং এটির মধ্যে নূতন বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিহার করে গণিতজ্ঞরা এই বৈশিষ্ট্যকে রূপ দেবেন। আকারনিষ্ঠবাদীদের মূল কথা হচ্ছে—গণিতের একটি আকার আছে। যে ধারণা এই আকারে প্রকাশ সম্ভব, সেই ধারণাই গাণিতিক ধারণা। প্রকৃত পক্ষে গণিত কতগুলি বস্তু ও প্রমাণসাধ্য প্রতিজ্ঞার সমষ্টি। গাণিতিক বস্তু দুই প্রকার—(i) কতকগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং (ii) অন্যান্যগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় জাতের গাণিতিক বস্তুগুলি পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রতিজ্ঞার আকারে বিবৃত করা হয়। কিন্তু প্রমাণ করা হয় না। অর্থাৎ প্রকল্প (hypothesis) হিসাবে ধরা হয়। (অপ্রমাণিত) প্রতিজ্ঞার সাহায্যে পূর্বোক্ত বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ধর্ম গাণিতিক প্রতিজ্ঞায় প্রকাশ করা হয় এবং এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা পূর্বউল্লিখিত সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার সাহায্যে প্রমাণ করা হয়। গাণিতিক প্রকল্পসমূহ সংগতিপূর্ণ, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরস্পরবিরোধী প্রকল্প থেকে কোন যুক্তি সম্মত গাণিতিক চিন্তা পেতে পারি না। যদি প্রকল্পসমূহের সাহায্যে কোন প্রতিজ্ঞা ও সম্পূর্ণ বিরোধী প্রতিজ্ঞা একই সংগে প্রমাণ করা যায় তাহলে এই প্রকল্প সমুহ অসংগতিপূর্ণ। গণিতের সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার সাহায্যে যে সব প্রতিজ্ঞা উপস্থিত করা হয় সেগুলি যদি প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করা সম্ভবপর হয় তাহলে প্রকল্প হিসাবে গৃহীত ঐ (অপ্রমাণিত) প্রতিজ্ঞাসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ধরে নিতে পারি। প্রকল্পসমূহের

পারস্পরিক স্বাতন্ত্রবোধ গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সৌষ্ঠবের পরিচয় দেয়।

স্বজ্ঞাবাদীরা গাণিতিক চিন্তায় কোন বস্তুর অস্তিত্ব ধরে নিতে চান না। এঁরা গণিতের মূল আলোচনায় বহির্বর্তী ন্যায় বা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হবার বিরোধী। মানুষের এমন একটি গাণিতিক সত্তা আছে যা যুক্তি তর্ক বা অন্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। এই সত্তা থেকেই মানুষ স্বাভাবিক সংখ্যা (natural numbers) 1, 2, 3,…ও এই সংখ্যার সাহায্যে মূল প্রক্রিয়াগুলি (fundamental operations) জানতে পেরেছে। গণিতের অন্যান্য ধারণা সংখ্যা ও মূল প্রক্রিয়ার সাহায্যে গঠন করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ঋণাত্মক সংখ্যা, মূলদরাশি প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। যা এই ভাবে গঠিত বা প্রমাণিত তাই হচ্ছে গণিতের অংশবিশেষ। অর্থাৎ গঠনমূলক প্রণালীতে যা কিছু সংজ্ঞা দেওয়া যায় এবং প্রমাণ করা সম্ভব তাই হচ্ছে গণিত।

প্রায়ই শোনা যায় গাণিতিক চিন্তা নাকি বিমূর্ত। হয়তো ভাবাবেগের ফলে এই ধারণা জন্মেছে। এটি চেতন বা অবচেতন অথবা বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা থেকেও আসতে পারে। যদি ভাবাবেগের কথা ছেড়েও দিই তাহালেও বলা যেতে পারে গাণিতিক চিন্তাধারা বিমূর্ত এবং বিমূর্ত চিন্তার একটি গুণ আছে। বিমূর্ত চিন্তা একটি মননজাত এবং বুদ্ধিসম্ভূত নির্বাচন (selection) বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এর দ্বারা সঠিক নির্বাচন এবং কোন লোক কি নির্বাচন করছে সে দিকে বুদ্ধির সাহায্যে আকৃষ্ট করাই এর লক্ষ্য। যে কোন যুক্তিজাত চিন্তাই নির্বাচনক্ষম এবং একীভূত (concentration)। সুতরাং এ দিক থেকে বিচার করলে আমরা বলতে পারি প্রত্যেকটি যুক্তিজাত চিন্তাই বিমূর্ত চিন্তা। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বলা যায় গাণিতিক চিন্তাধারা মাত্রই বিমূর্ত। গাণিতিক বিমূর্ততা অত্যন্ত কঠিন, সূক্ষ্ম ও যুক্তিসম্মত চিন্তা। সুতরাং এর সংজ্ঞা ও কার্যক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে ও নির্ভুলভাবে সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি ধরে নেওয়া যায় কঠিন ধ্যান ধারণা গাণিতিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নয় তাহলে প্রতীকীকরণের সংগে সংযোগ এবং যুগ্মভাব এর বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। গণিতে প্রতীকের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। গাণিতিক চিন্তায় সুস্পষ্টভাবে এবং সার্থকভাবে প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তা অত্যন্ত

সতর্কতার সংগে বিচার বিবেচনা করার পরই স্বেচ্ছায় ব্যবহার করা হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

আমরা গণিত বলতে logic, বিমূর্তচিন্তা বা সৃজনশীল আর্ট প্রভৃতি বুঝলাম। তবে এ ধরণের মতসমূহকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে দ্বিধা আছে। মনে হয় সংখ্যা, জ্যামিতিক আকার ইত্যাদি চেতনার চেয়ে গণিতের উক্ত ধারণাসমূহ অনেক অর্থবহ। Halmos' এর ভাষায় বলতে গেলে আমাদের বলতে হয়—"Mathematics is the logical dovetailing of a carefully selected sparse set of assumpations with their surprising conclusions via a conceptually elegant proof. Simplicity, intricacy, and above all logical analysis are the hallmarks of mathematics.

সৌভ্রাতৃত্ব একটি মূল্যবান কথা। গণিতের ক্ষেত্রেও সৌভ্রাতৃত্বের অস্তিত্ব বর্তমান। বলা বাহুল্য গাণিতিক সৌভ্রাতৃত্ব কতকটা চিরস্থায়ী পুরোহিত তন্ত্রের মত। আজকের গণিতজ্ঞ আগামীকালের গণিতজ্ঞকে শিক্ষা দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় কাকে এই কর্মযজ্ঞে পুরোহিত করা হবে। অধিকাংশ লোকই ভেবে থাকেন এই কর্মযজ্ঞে বুঝি বা প্রবেশাধিকার সকলের নেই। কথাটি আংশিকভাবে সত্য। কারণ গণিতে মেধা এবং সৃজনশীলতা গায়ক বা কবিদেরই মতই দুর্লভ। কিন্তু এই দুর্লভের ব্যাপার থাকলেও গণিতের ক্ষেত্রে সকলেই যোগদান করতে পারে এবং সকলকেই স্বাগত জানান হয়। কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। শুধুমাত্র স্বজ্ঞাবোধই প্রত্যেককে এদিকে আকৃষ্ট করবে। যদি কেউ ভুল করেন বা অস্পষ্ট চিন্তাধারা নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসেন তাহলেই ক্ষমার চক্ষে দেখা হয় কিন্তু যেটা অপরিহার্য তা হচ্ছে গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। ভাসা ভাসা চিন্তা ; বৃথা বাগাড়ম্বর বা বিতর্কমূলক চিন্তা গাণিতিক চিন্তায় স্থান নেই। বলা বাহুল্য এই সমস্ত কিছু গাণিতিক চিন্তাকে অন্যান্য বিষয় (subject) থেকে পার্থক্য করে রেখেছে। আর এই পার্থক্য হেতু গণিত অপ্রতিহত ভাবে এগিয়ে চলেছে। এর শেষ কোথায় অথবা আদৌ কোন দিন শেষ হবে কিনা তা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে। আমরা বর্তমানে এর বিকাশলাভে কিছুটা সংযোজন করে সহায়তা করছি মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

গাণিতিক সৃজন

গাণিতিক তত্ত্ব যাঁরা আবিষ্কার করেন তাঁদের প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদল গণিতবিদ আছেন যাঁরা গাণিতিক চিন্তায় মূলতত্ত্বের প্রবক্তা। অন্যদল হচ্ছেন প্রথম দলের অনুসরণকারী। অর্থাৎ দ্বিতীয় দলের গণিতবিদ প্রথম দলের চিন্তাধারাকে ব্যাপক অথচ সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ করে নূতন গাণিতিক তত্ত্বের জন্ম দেন। বলতে দ্বিধা নেই এক্ষেত্রে এঁরা প্রথম দলের প্রভাবাধীন। প্রথমদলের গণিতবিদরা উর্ণনাভের মত; এঁরা নিজেরাই গাণিতিক চিন্তার সূক্ষ্ম জাল বোনেন। কিন্তু উভয় দলের মধ্যেই গাণিতিক চিন্তায় মধ্যপন্থা অনুসরণকারী কম। অর্থাৎ আপন চিন্তার ক্ষমতার বলে গণিতিক চিন্তার নূতনত্ব এনে আবার তাকে বিভিন্ন শাখায় প্রয়োগ করবার কথা খুব কম গণিতবিদই চিন্তা করে থাকেন। বলা বাহুল্য যদি কোন গণিতবিদ স্বজ্ঞা প্রসূত গাণিতিক চিন্তাধারায় ন্যায়ের মিশ্রণ বা আকারনিষ্ঠ চিন্তাধারার মিশ্রণ ঘটিয়ে দেবার মনোবৃত্তি গ্রহণ করেন তাহলে যে মিশ্র গাণিতিক চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে হয়তো তা গণিতশাস্ত্রে একটি নূতন দিক খুলে দিতে পারে। অবশ্য একথা সত্য—গাণিতিক চিন্তা প্রকৃতি দর্শন সৃষ্টি করে না কিন্তু প্রকৃতি দর্শনকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়।

গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে যে সৃষ্টি তার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় প্রত্যয় ও ধীশক্তি। নূতন গাণিতিক তত্ত্ব সৃষ্টি করতে গেলে অনেক সময় পূর্বের গাণিতিক তত্ত্ব ও প্রচলিত গাণিতিক চিন্তাধারাকে জলাঞ্জলি দিয়ে গাণিতিক চিন্তনের নানাবিধ পরীক্ষা করতে হয়। অস্পষ্টতা, আকস্মিকতা ও শিশুসুলভ ধারণাসমূহের প্রতিমিশ্রণ কখনই গাণিতিক সৃজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গাণিতিক তত্ত্ব সৃজনের ক্ষেত্রে মুক্ত মন ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। কিন্তু গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা তা একদিনে আসে না। এরজন্য প্রয়োজন পূর্বের গাণিতিক তত্ত্ব দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা এবং তারপর নিজস্ব চিন্তাধারায় সেই তত্ত্বকে নূতনভাবে রূপ দিতে হয়। ভাসা ভাসা গাণিতিক ধারণা বা অর্ধসমাপ্ত গাণিতিক ধারণা নিয়ে গাণিতিক তত্ত্বের

শরীক হলে হয়তো সেই গাণিতিক তত্ত্বের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে পারে। গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে যে স্বজন তা এমন পর্যায়ে করা হয় না যার অনেক কিছু সঠিকভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি বা নির্ভুল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি বা সেগুলি পর্যালোচনা করা হয়নি। বলা বাহুল্য গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে এ ধরণের ব্যাপার ঘটলে এ থেকে স্বষ্ট গাণিতিক তত্ত্বের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

লক্ষ্য করলেই দেখা যায় গাণিতিক তত্ত্বের স্বজনের ক্ষেত্রে ন্যায়ের (Logic) সহযোগিতা বেশী। কিন্তু উপলব্ধিজাত গাণিতিক তত্ত্বের স্বষ্টির মধ্যে একটি নূতন দিক সাধারণত উন্মোচিত হয়। অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায় স্বজ্ঞাপ্রসূত গাণিতিক তত্ত্বই বহুক্ষেত্রে কাম্য। অনেক সময় দেখা যায় যে সব গাণিতিক তত্ত্বের স্বজনে ন্যায়ের আধিক্য বেশী সেখানে হয়ত এই স্বজন কার্য সংগঠনের পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, হয়তো বা অন্যকিছু ভাববার অবকাশ পায়না। হয়তো ন্যায়জাত গাণিতিক তত্ত্বের স্বজনে সাধারণ গণিতবিদ ও অসাধারণ গণিতবিদ উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক সময় এই ধরণের গাণিতিক তত্ত্বের স্বজন কতকটা হেতু নির্ণয়ে ফলপ্রস্থ; এবং এটি বিফল হয় না। কারণ কোন বিশেষ গাণিতিক চিন্তনে যে ধরণের ধারণা পরিবর্তনের প্রয়োজন তার চেয়ে স্বাভাবিক হেতু নির্ণয়ে এই ন্যায় ভিত্তিক গাণিতিক তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা বেশী। হয়তো একথার বাদ প্রতিবাদ উঠতে পারে তবে এটি অনেকাংশে অখণ্ডনীয় তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত যে সব গাণিতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তা থেকে এই গাণিতিক তত্ত্বের স্বজন শুধুমাত্র আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্রই হবে না পরন্তু এর বিস্তৃতিও হবে ব্যাপক। এর জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি ও ভিন্ন ধরণের গাণিতিক চিন্তন। অভিজ্ঞতা এই ধরণের গাণিতিক তত্ত্বের স্বষ্টির ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু যদি এই অভিজ্ঞতা স্বেচ্ছাক্রমে নিজস্ব পথ অনুসরণ করে তাহলে গাণিতিক তত্ত্বের স্বজন অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে অথবা গাণিতিক স্বষ্টির ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করবে।

গাণিতিক তত্ত্বের আবিষ্কারে উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির বহুল ব্যবহার প্রয়োজন। শুধুমাত্র উপলব্ধি বা স্মৃতির সহায়তা থাকলেই গাণিতিক তত্ত্ব

আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। যদিও বা কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হয় তবে তা তাৎক্ষণিক।

গাণিতিক তত্ত্বের সংখ্যা প্রচুর এবং এগুলির মধ্যে অনেকগুলি যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত, ফলে অনেক সময় আমাদের গাণিতিক ধারণায় যে উপলব্ধি তাকে কিছুটা বিযুক্ত ও বিহ্বল করে। সুতরাং যখনই কোন গাণিতিক তত্ত্ব বা ধারণা আবিষ্কার করতে যাওয়া হয় তখনই আবিষ্কারের বিষয়াবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট গাণিতিক তত্ত্ব বা ধারণাকে যথার্থভাবে সুশৃঙ্খলিত, সুবিন্যস্ত ও সুপ্রযুক্ত এমনভাবে করা প্রয়োজন যাতে এগুলি অর্থব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। যদি গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও বিক্ষিপ্ত মনসংযোগ থেকে থাকে তাহলে কোন মহৎ গাণিতিক তত্ত্ব এ থেকে আবিষ্কৃত হতে পারে না। কোন গাণিতিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আহরিত গাণিতিক ধারণা এবং উপলব্ধিকে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যাস্ত করতে হয়। এবং এই সব ধারণা মননের অত্যন্ত গভীরে নিয়ে গিয়ে বার বার সমীক্ষা করতে হয়। এ না করে যদি অর্ধসমাপ্ত করে নূতন তত্ত্বের দিকে মনোনিবেশ করা যায় তাহলে হয়তো পূর্বের এবং পরের গাণিতিক তত্ত্বগুলি ততটা জোরদার হবে না।

যখনই কোন উপলব্ধিজাত গাণিতিক চিন্তা মনে আসবে তখনই কিন্তু কোন গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা উচিৎ নয়। অথবা কোন গাণিতিক তত্ত্ব এক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হলেও তাকে একটি অনড় গাণিতিক তত্ত্ব বলে স্বীকার না করে ঐ উপলব্ধিজাত গাণিতিক চিন্তাকে বারবার বিচার বিশ্লেষণ করা উচিৎ। বলাবাহুল্য তাৎক্ষণিক উপলব্ধিজাত গাণিতিক চিন্তা এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের ভিত্তিতে কোন মাধ্যমিক (intermediatory) গাণিতিক তত্ত্বের সিদ্ধান্ত গঠন এবং সেটিকে প্রমাণ করতে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তার কারণ তাৎক্ষণিক গাণিতিক চিন্তায় যে যে উপলব্ধি তার মধ্যে হয়তো কিছুটা ভ্রান্তি থাকতে পারে ফলে এক্ষেত্রে যে সব গাণিতিক তত্ত্ব পাওয়া যাবে তা অনেক সময় নিম্ন মানের। অর্থাৎ গাণিতিক চিন্তায় যদি অস্থিরতা থাকে তাহলে এই চিন্তা থেকে নিম্নমানের গাণিতিক তত্ত্ব বা চেতনা আমাদের সম্মুখে হাজির হবে।

গাণিতিক তত্ত্বের প্রমাণের ক্ষেত্রে অনেক সময় আরোহ পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হয়। শুধুমাত্র যৌক্তিক বাক্য বা গাণিতিক চেতনার বা উপলব্ধির

সাহায্য নিলেই চলবে না আরোহ পদ্ধতির সঙ্গে অনেক সময় কিছু প্রকল্প (hypothesis) বা স্বতঃসিদ্ধের সংমিশ্রণ হওয়া প্রয়োজন, নতুবা গাণিতিক তত্ত্বের সৃজনে যে গাণিতিক ধারণা তা অনিশ্চিত ও বিপরীত দৃষ্টান্তে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। মনে হয় গাণিতিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে গেলে কোন গাণিতিক সংজ্ঞার প্রয়োজন, এবং তারপর যদি আরোহ বা অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তাহলে অনেক গাণিতিক চেতনার উন্মেষ হবে যা পূর্বে ভাবা যায়নি। মনে হয় গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা গাণিতিক তত্ত্ব সমূহে প্রত্যয় গঠন করা অপরিহার্য।

এই ধরণের আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ গঠন করলে তখন লক্ষ্য হওয়া উচিত এই গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ যে সব গাণিতিক তত্ত্ব বিশেষ ও নির্দিষ্ট গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ থেকে উদ্ভূত তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। বস্তুত এই গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপক হলেও এই ধরণের বিশ্লেষণ গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারে সহায়ক হয়। মনে রাখতে হবে গণিতের বিভিন্ন শাখায় যে সব তত্ত্ব আছে বা স্বতঃসিদ্ধ আছে তাদের মূল গাণিতিক ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। যদি তা করা যায় তাহলে গাণিতিক তত্ত্বের অসারত্ব প্রমাণিত হতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় বিশেষ (particular) গাণিতিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে লিপ্ত না হয়েও অন্য একটি গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়ে থাকে। তাহলে এক্ষেত্রে বলা যায় বিশেষ গাণিতিক তত্ত্বের অন্বেষাই যদি কোন গণিতবিদের লক্ষ্য ও কর্তব্য হয়ে থাকে এবং অনুসন্ধানের পদ্ধতি যদি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ না হয়ে সঠিক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ হয়, তা হলে নিশ্চয়ই আরও কিছু গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব। অনেক সময় এমন ঘটনাও ঘটে যে দিনের পর দিন বহু কষ্ট ও চিন্তা করেও কোন গাণিতিক তত্ত্বের সূত্র সন্ধান করা যাচ্ছে না; হয়তো আকস্মিক চিন্তার ফলে কোন একটি গাণিতিক তত্ত্বের সূত্র পাওয়া গেল। এসব ক্ষেত্রে বলা হয় মানুষের গাণিতিক চিন্তার সুশৃঙ্খলতা ও যুক্তি যদি সুনির্দিষ্ট কোন উপলব্ধিজাত গাণিতিক চিন্তনে প্রয়োগ করা যায় তাহলে হয়তো কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে পারে। হয়তো বা এই গাণিতিক তত্ত্বের আবিষ্কার অতীতের আবিষ্কার সমূহের উৎসস্বরূপ।

কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এ

বিষয়ে চিন্তা করা সম্ভব হয় না। হয়তো অসাধ্য বলে এ ধরণের গাণিতিক চিন্তা থেকে অনেকে দূরে সরে থাকেন। সাধারণত যে সব গাণিতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তার সাহায্যে সম্ভাব্য গাণিতিক চিন্তার ধারণা গড়ে তোলা হয়। অর্থাৎ প্রাচীন গাণিতিক ধ্যান ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয়ে মানুষ নূতন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারে মন দেয়। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে যুগান্তকারী কোন গাণিতিক তত্ত্ব অনেক সময় আবিষ্কৃত হয় না। গাণিতিক চিন্তা জগতে এমন অনেক তত্ত্ব সুপ্ত অবস্থায় থাকে যা আমাদের পরিজ্ঞাত গাণিতিক তত্ত্বের বা গাণিতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তুলনীয় নয়। একথা সত্য যে এই ধরণের গাণিতিক তত্ত্ব যা গাণিতিক চিন্তনের সাহায্যে আবিষ্কার করতে হয় তা অনেক সময় আমাদের গাণিতিক চিন্তনের ত্রিসীমানার মধ্যে থাকে না। এ ধরণের গাণিতিক চিন্তার সাহায্যে অনেক তত্ত্বই বহুদিন অনাবিষ্কৃত থাকে। এমন অনেক গাণিতিক চিন্তন আছে যা আমাদের সম্মুখে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে থাকে। অথচ এগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ মনঃসংযোগ না করে অবহেলা করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—স্থানিকবৃত্তের (Topology) সঙ্গে গোত্রতত্ত্বের (Group theory) সংযোজন করে নতুন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু আমরা এভাবে আমাদের গাণিতিক চিন্তনকে গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারে লাগাই না।

গাণিতিক চিন্তনের প্রকৃতি এমনই যে কোন গাণিতিক তত্ত্ব প্রথম যখন আমাদের গাণিতিক সত্তাজাত উপলব্ধির মধ্যে ধরা দেয় তখন আমরা এই গাণিতিক তত্ত্বটি সম্পর্কে মনে সন্দেহ পোষণ করি। হয়তো বা অবজ্ঞাও করি। আমাদের গাণিতিক চিন্তাধারা অনেক সময় এমন পর্যায়ে থাকে যে আমরা বিশ্বাসই করতে পারি না আমাদের দ্বারা এই ধরণের গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে পারে। তারপর যখন এই গাণিতিক তত্ত্বটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন ভাবা হয়—এই গাণিতিক তত্ত্বটির আবিষ্কার থেকে এতকাল কেন আমরা বঞ্চিত ছিলাম। বলা বাহুল্য এ ধরণের পর্যালোচনা গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে রসদ যোগায়। গণিতের এমন বহু তত্ত্ব আছে যা এখনও অনাবিষ্কৃত। শুধুমাত্র গাণিতিক উপলব্ধি (Concept) দ্বারা এগুলির অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকলে চলবে না। ইতিপূর্বে উদ্ভাবিত গাণিতিক তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করে এবং গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা তার সংমিশ্রণ

ঘটাতে হবে। এবং এই সঞ্চিত গাণিতিক চিন্তনের অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে আমরা গাণিতিক তত্ত্ব বা ধারণা আবিষ্কার করব।

অনেক সময় দেখা যায় এমন অনেক গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা হ'ল যার মূল্যায়ণ করলে অতি নগণ্য বলে মনে হবে যদি ভাবা যায় এত ভাবনা ও সময় এই গাণিতিক তত্ত্বটির পিছনে ব্যয় করা হল কিন্তু কি ফল পাওয়া গেল? বলতে দ্বিধা নেই এ ধরণের মনোবৃত্তি গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করার সময় মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

এত বেশী গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হচ্ছে যে অনেক সময় এগুলির সংখ্যাধিক্য দেখে গাণিতিক চিন্তায় বিহ্বলতা এসে পড়ে। মনে হয় গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করার সময় এ মনোভাব থাকা বাঞ্ছণীয় নয় বরঞ্চ সংখ্যাধিক্যের প্রাবল্য দেখে উৎসাহিত হওয়া উচিত। পূর্বে আবিষ্কৃত গাণিতিক তত্ত্ব সমূহকে সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে বিশ্লিষ্ট ও স্বতন্ত্র করে বিচার করলে লক্ষ্য করা যাবে এগুলি গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত। উপরন্তু এই পথে গাণিতিক চিন্তনকে নিয়ন্ত্রিত করলে আমরা একটি সঠিক পথে উপনীত হবার তোরণদ্বারে সন্নিকটবর্তী হবো। কিন্তু যদি এভাবে গাণিতিক চিন্তধারাকে কাজে না লাগাই তাহলে আমরা আমাদের গাণিতিক চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না, ফলে বহু মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটবে।

কোন একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক তত্ত্ব থেকে গাণিতিক চিন্তার সাহায্যে অন্য কোন গাণিতিক তত্ত্ব আমরা যখন অন্বেষণ করি এবং তারপর মূল্যায়ণ করার পর দেখা গেল অতি সামান্যই লাভবান হয়েছি তবু এক্ষেত্রে গাণিতিক চিন্তা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ আদৌ যদি এ ধরণের গাণিতিক চিন্তা না করি তাহলে হয়তো আমরা অনেক মূল্যবান গাণিতিক তত্ত্ব বা ধারণা হারাতে পারি। হয়তো কোন কোন গণিতবিদ বলতে পারেন এ ধরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সময় ও উৎসাহ নষ্ট হয়। কথাটি ঠিক, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যা হারাই তা হচ্ছে কিঞ্চিৎ শ্রম। যে সব গাণিতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তার চেয়ে যেগুলি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত নয় সে সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান করলে হয়তো কিছু আশার সঞ্চার করতে পারে। অবশ্য এই ধরণের গাণিতিক চিন্তার স্বকীয়তা ও বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। গাণিতিক সৃজনে হতাশা

সৃষ্টি হলেও তাকে আমল দেওয়া উচিত নয়। কারণ হতাশাই গাণিতিক চিন্তনের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক ও গাণিতিক সৃজনে বিলম্ব ঘটায়।

গাণিতিক তত্ত্ব সৃজনের ক্ষেত্রে বিমূর্ত ধারণা অনেক সময় কার্যকরী কিন্তু এটি সাধারণ লোকে হৃদয়ঙ্গম করে না। ফলে এইসব গাণিতিক তত্ত্ব সৃজনের অসাধারণত্ব ও ব্যাপ্তি কত সে সম্পর্কে জনমানসে সঠিক ধারণা থাকে না। তাই বলে কি বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তার সাহায্যে সর্বজনীন (Universal) গাণিতিক তত্ত্ব উদ্ভাবনের ইচ্ছা থাকবে না। একথা ভাবলেও শঙ্কা জাগে। এ যদি হয় তাহলে গাণিতিক সৃজন অবলুপ্তির পথে পা বাড়াবে।

যখনই কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয় তখনই একটি আদর্শ গড়ে তোলা আবশ্যক। নির্দিষ্ট গাণিতিক ধারণা এবং এরই সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হবে এই প্রতিশ্রুতি মনের মধ্যে অহরহ অনুরণিত হওয়া প্রয়োজন। যখনই কোন ধারণার উপলব্ধি আমাদের মনে জাগে তখন বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত এবং গাণিতিক চিন্তনের নিষ্ঠার প্রমাণস্বরূপ উচিত কোন ফলপ্রসূ গাণিতিক তত্ত্বের সৃজন। অনেক সময় গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গেলে হেতু ও গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ গঠন করা প্রয়োজন এবং এই হেতু ও স্বতঃসিদ্ধকে গাণিতিক চিন্তায় পুনরায় কাজে লাগিয়ে যুক্তিসম্মত বিচার বিশ্লেষণ করে কোন নূতন গাণিতিক সিদ্ধান্তে (অর্থাৎ আমরা যাকে বলি গাণিতিক তত্ত্ব) উপনীত হওয়া প্রয়োজন।

হেতু ও গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে কোন গাণিতিক তত্ত্বের অসারত্ব বা ভ্রান্তি প্রমাণ করতে হবে। এই হেতু বা গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধকে নূতন চিন্তাজাত কোন গাণিতিক ধারণা থেকে উদ্ভূত হতে হবে। যদি কোন গাণিতিক ধারণায় ভুল থাকে তাহলে সে ভ্রান্তি পরবর্তী কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে ফলে দিনের পর দিন আমরা একটি ভ্রান্ত গাণিতিক তত্ত্বের সাক্ষাৎ পেতে থাকবো। সুতরাং যখনই কোন গাণিতিক তত্ত্ব বা ধারণা আবিষ্কারে সচেষ্ট হবো তখনই মনে রাখা প্রয়োজন এই আবিষ্কার অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এবং এটি নিষ্ঠা ও আন্তরিক যত্ন এবং সতর্কতা সহকারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এমন অনেক গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয় যা খুবই সূক্ষ্ম ও কল্পনাত্মক ফলে এই তত্ত্বসমূহ অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু গণিতবিদকে এ

ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। দেখা গেল কোন গণিতবিদ তাঁর গাণিতিক চিন্তাধারাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে এলেন যা অসাধারণ ও অতুলনীয় কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কোন স্থির গাণিতিক সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। এক্ষেত্রে গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গেলে গাণিতিক চিন্তাসমূহের কারণসমূহ ও ঐ কারণসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যদি এ ব্যাপারে সাফল্যলাভ না করা যায় তাহলে মনে হয় পরিমিত ও সাধারণ গাণিতিক ধারণাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। হয়তো বা গাণিতিক চিন্তার বিচ্ছিন্নতাও এই সব গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক তত্ত্বের আবিষ্কার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। গাণিতিক তত্ত্ব তা যতই নগন্য হোক, সেটিকে মর্যাদা সহকারে চিন্তা করা আবশ্যক এবং গাণিতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত করাও প্রয়োজন অর্থাৎ অস্তিত্বের প্রয়োজন। তার কারণ গাণিতিক সৃজন তার অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব।

এমন অনেক গাণিতিক তত্ত্ব বা ধারণা আবিষ্কার করা হয় যা সাধারণ গাণিতিক ধারণা বা তত্ত্ব অনুযায়ী কিংবা প্রচলিত গাণিতিক চিন্তায় উপলব্ধি জাত প্রথার সঙ্গে আপাত সম্পর্কহীন, বে-মানান ও বেখাপ্পা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তাই বলে এ ধরণের গাণিতিক ধারণার বা তত্ত্বের প্রয়োজন নাই তা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সংহতি তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন এটির রূপ বা ধারণা জর্জ ক্যাণ্টর দেন তখন কি ভাবতে পারা গিয়েছিল এর ব্যাপ্তির কথা। হয়তো এই ধারণা বা তত্ত্বের আবিষ্কারের সময় তাঁকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হয়তো বা এটি প্রচলিত গাণিতিক ধারণা বা উপলব্ধির সঙ্গে বেমানান বা বেখাপ্পা মনে হয়েছে। কিন্তু তখন যদি এই ধারণাকে সম্পর্কহীন বলে আমল দেওয়া না হোত তাহলে আজ স্থানিকবৃত্তের (Topology) এত উন্নতি ঘটত না অথবা আদৌ স্থানিকবৃত্তের জন্ম হতো কিনা যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

যখন কোন গাণিতিক ধারণা বা তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয় তখন কিন্তু পূর্বের গণিতবিদের আবিষ্কৃত তত্ত্বকে একেবারে নস্যাৎ করা উচিত নয়। ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে এটিকে নস্যাৎ করা উচিত এবং তারপর বিচার বিশ্লেষণ করে নিজের তত্ত্বটিকে উপস্থিত করা উচিত। হয়তো এ ধরণের মনোবৃত্তির সাহায্যে গাণিতিক তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে সর্বদাই ত্রুটিমুক্ত হবে তা বলা যায় না। প্রাথমিক গাণিতিক ধারণায় যদি ত্রুটি দৃঢ় মূল না হয় তাহলে ত্রুটি সংশোধন-

কালে নূতন কিছু গাণিতিক ধারণা বা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে পারে। গাণিতিক ধারণা বা তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গেলে ত্রুটিপূর্ণ লক্ষ্য ও বিবেচনা এবং গাণিতিক চিন্তাজাত দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা থাকলে চলবে না। অর্থাৎ গাণিতিক ধারণার ক্ষেত্রে মৌল ত্রুটি থাকলে চলবে না। গাণিতিক ধারণার ক্ষেত্রে অর্ধসমাপ্ত বা আংশিক কোন চিন্তার স্থান নেই। কারণ যতক্ষণ না এই গাণিতিক ধারণা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় ততক্ষণ এর মূল্য নেই। এমন অনেক গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়ে থাকে যা আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্যতা তাঁদের কাছেই লাগে যাঁরা শুধুমাত্র প্রচলিত গাণিতিক ধারণা ও গাণিতিক তত্ত্বের মধ্যে নিজেদের চিন্তাকে সীমায়িত বা নির্ধারিত করে থাকেন। ফলে অনেক সময় এই দুর্বোধ্য গাণিতিক তত্ত্বকে নির্বাসিত করা হতে পারে। কিন্তু এগুলি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় এগুলির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অপরিসীম। যখন কোন গাণিতিক ধারণাকে রূপ দেওয়া হয় বা গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয় তখন কিন্তু গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ আবিষ্কারের পূর্বে গাণিতিক চিন্তাসমূহের পর্যালোচনা এবং বিরোধগুলি নিয়ে মননের সাহায্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিত। এ ধরণের মনোবৃত্তি যদি গ্রহণ না করে কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয় এবং এগুলির প্রয়োগ করা হয় তাহলে তা অসময়োচিত ও অযৌক্তিক হয়ে পড়বে। সুতরাং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্য ও যথার্থ গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ গঠন করা উচিত। নতুবা অন্যধরণের সূক্ষ্মতা গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারে আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করলেও গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না।

গাণিতিক ধারণায় রূপ দেবার পর বা গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করার পর মনে হতে পারে ইতিপূর্বে যে সব গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে তারই একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে সেইজন্য যখনই কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে যাওয়া হয় তখন মনে রাখা উচিত—ইতিপূর্বে গণিতজ্ঞরা যে সব গাণিতিক তত্ত্ব বা ধারণা আবিষ্কার করেছেন সেগুলি সংগ্রহ করা কর্তব্য। তারপর এগুলি বিভিন্ন শাখায় বা অন্য কোন সুবিধাজনক ভাবে ভাগ করা উচিত, এবং এগুলির মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে নিজের চিন্তাধারার সঙ্গে মিল আছে এমন সব তত্ত্ব বা ধারণাগুলি গভীর মনঃসংযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা

উচিত। তারপর নিজস্ব চিন্তাধারার সাহায্যে নূতন কিছু গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারে প্রয়াসী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় গণিতের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে গাণিতিক সিদ্ধান্তে বা গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধে উপনীত হওয়া যায়। এই গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ থেকে অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্ত ও প্রমাণের মাধ্যমে গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায়।

গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটি ক্রমপর্যায় আছে। অনেক সময় সামান্য গাণিতিক চিন্তার সাহায্যে একটি গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধে আমরা উপনীত হই। কিন্তু এই গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধটি সঙ্গে সঙ্গে প্রচার না করে আরও সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত। অবশ্য একথা ঠিক যে মনের যে সত্য ধারণের ক্ষমতা আছে তার উপর সন্দেহ পোষণ করে বিচার বিশ্লেষণ করতে যাওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ সত্যকার গাণিতিক চিন্তনের উপলব্ধিকে মূল্য দেওয়া উচিত। গণিতবিদদের অববোধে যে অন্তর্নিহিত উপলব্ধি আছে তাকে অপসারিত না করে তারই সাহায্যে গাণিতিক চিন্তাকে পরিচালিত করলে হয়তো বা নূতন কোন গাণিতিক তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে। গাণিতিক তত্ত্ব যিনি আবিষ্কার করবেন তাঁর চিন্তায় হয়তো নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু এই প্রতিবন্ধক থেকে নিজের গাণিতিক চিন্তাকে মুক্ত করে বিশ্লেষণ করা উচিত। সব কিছু দেখে মনে হয়—গাণিতিক ধারণার ক্ষেত্রে বা গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি ও উপযোগীতা অপেক্ষা গাণিতিক সত্যের অনুসন্ধান মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর।

চতুর্থ অধ্যায়

গাণিতিক চিন্তার সূত্র সন্ধানে

প্রজ্ঞা ও সত্যের অনুশীলনই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কাজে সহায়তার জন্য গণিতের প্রয়োজন। অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় গাণিতিক চিন্তা অপরিহার্য। যাঁরা এ ব্যাপারে তাঁদের সময় ও শ্রমের বেশীর ভাগ অংশ নিয়োজিত করেছেন অনুমান করা যেতে পারে তাঁদের ধৈর্য ও প্রশান্তি অন্যান্যদের তুলনায় বেশী। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এঁদের গাণিতিক চিন্তা বেশী শুদ্ধ, স্বচ্ছ এবং পরিশীলিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এঁদের গাণিতিক চিন্তায় সংশয় ও সমস্যার দোলা কম লেগে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীত চিত্রই আমরা দেখতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ত্রিভুজের কথা ধরা যেতে পারে। যখন কোন অজ্ঞ লোক এটি দেখবেন তখন তিনি তিনটি বাহুর কথাই ভাববেন। এটি তাঁর কাছে দুর্জ্ঞেয় বা দুর্বোধ্য মনে হবে না। গাণিতিক চিন্তার প্রামাণ্যতার ব্যাপারে তাঁর হয়তো কোন অভিযোগ থাকবে না। অর্থাৎ তিনি সংশয়বাদ থেকে মুক্ত। কিন্তু যাঁরা এ ব্যাপারে চিন্তা করে থাকেন তাঁদের মনে হাজার রকম প্রশ্ন দেখা দেয়। অর্থাৎ তাঁরা চিন্তা করবেন সব বাহুগুলি সমান কিনা, কোনটি ক্ষুদ্র কোনটি বৃহৎ। কোণগুলিই বা কেমন ; দুটি বাহু সমান কিনা ইত্যাদি। অর্থাৎ ত্রিভুজটি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে জানতে পেরেছেন এ চিন্তা করতেও তাঁর মনে দ্বিধা জাগবে। হয়তো ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি বা গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি তাঁর মনে বাসা বেঁধে থাকবে। গাণিতিক চিন্তা এবং সত্তার সাহায্যে এই পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়তো অজান্তে অদ্ভুত পূর্বাভাষ, সমস্যা ও অসঙ্গতির মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়েন। গাণিতিক চিন্তা যত অগ্রসর হতে থাকে এই সমস্যার সংখ্যা ও আয়তন ততই বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে অনেক জটিল গাণিতিক চিন্তার গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়ান। হয়ে। অনেক সময় অসহায়ভাবে গাণিতিক চিন্তাধারার সংশয়বাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন।

গাণিতিক চিন্তার দুর্বোধ্যতা (abstruseness) বুদ্ধির স্বাভাবিক দুর্বলতা বা অপূর্ণতাকেই এই ধরণের গাণিতিক সংশয়বাদের দিকে ঠেলে দেয়। গাণিতিক চিন্তার মধ্যে যে সত্তা ও গঠন প্রকৃতি আছে তা সব সময় আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় না। অনেক সময় আমরা বিমূর্ত গাণিতিক ধারণার দিকে ঝুঁকে পড়ি, কিন্তু এই বিমূর্ত গাণিতিক ধারণাকে উপলব্ধি করতে গেলে কিছুটা ইন্দ্রিয়জাত গাণিতিক ধারণার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। সুতরাং এই বিমূর্ত গাণিতিক ধারণার জন্য অনেক সময় আপাত বিরোধী অযৌক্তিক ও অসংগতির মধ্যে আমাদের গাণিতিক চিন্তাসূত্র গিয়ে পড়ে যা থেকে অনেক সময় মুক্তি পাওয়া যায় না।

অনেকে আছেন যাঁরা মনে মনে উপলব্ধি করেন এই সংশয়, অনিশ্চয়তা, অযৌক্তিকতা ও অসঙ্গতি চিন্তাধারা এসেছে কতকগুলি সূত্র থেকে। হয়তো প্রথম শ্রেণীর গণিতবিদদের ধারণা গাণিতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে অজ্ঞতা আছে তার উৎস আমাদের গাণিতিক ধারণাগুলির স্বাভাবিক স্থূলতা ও অপূর্ণতার মধ্যে নিয়োজিত। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে গাণিতিক ধারণার ক্ষেত্রে এই স্থূলতা ও অপূর্ণতাই গাণিতিক চিন্তনের বা সত্তার যে সত্যতা আছে তার সন্ধান ক্ষেত্রে পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং হয়তো হতবুদ্ধিও করে দেয়। অনেক সময় কতগুলি ভেক গাণিতিক সত্তাজাত চিন্তার উপর জোর দেওয়া হয় কারণ এগুলিকে এড়ানো সব সময় সম্ভব হয় না। এই হেতু এই ভেক গাণিতিক সত্তাজাত চিন্তাধারা যতটা দায়ী গাণিতিক চিন্তনের অসচ্ছতা ও জটিলতা কিংবা গাণিতিক চেতনার স্বাভাবিক ত্রুটি ততটা দায়ী নয়। গণিতবিদেরা গাণিতিক ধারণাগুলিকে যে পদ্ধতিতে খাটিয়ে থাকেন ত্রুটিটিকে মূলতঃ সেই পদ্ধতির উপর আরোপ না করে গাণিতিক ধারণাগুলির উপর তা আরোপ করতে গিয়ে গণিতবিদেরা নিজেদের উপর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করে বসেন। অনেকসময় গণিতবিদেরা ভাবেন নির্ভুল সূত্র থেকে সঠিকভাবে অনুমান করেও হয়তো তাঁরা অগ্রাহ্য বা অসংগত সিদ্ধান্ত পৌছাবেন। মনে হয় যদি কোন অসংগত সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌছেও থাকেন তাহলে অনুমান করা যেতে পারে প্রথম থেকেই তাঁদের গাণিতিক ধারণায় ভ্রান্তি ছিল। কারণ গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে সৃষ্টি তার মধ্যে নিশ্চয় একটা উপায় বা গাণিতিক সমস্যার সমাধান থাকবে যার সঠিক ব্যবহার বা প্রয়োগ মানসিক তৃপ্তি নিয়ে

আসবে। যে সব চিন্তাপ্রসূত সমস্যা যা গাণিতিক চিন্তনের সহায়ক তা হয়তো এতদিন দার্শনিকদের মনের খোরাক জাগিয়েছে। এবং এরই ফলে গাণিতিক ধারণাজাত যে জ্ঞান তার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য এর জন্য গণিতবিদেরাই দায়ী কারণ প্রথমে ধূলো তাঁরাই উড়িয়েছেন এখন দেখতে না পাবার নালিশ জানালে কি হবে।

গাণিতিক চিন্তায় যে সত্তা সেই সত্তার মধ্যে অনেক সময় নানারকম গাণিতিক ধারণা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই সব গাণিতিক ধারণা এমন অবস্থায় থাকে যে সহসা এই সব গাণিতিক ধারণা থেকে কোন তত্ত্ব বা তথ্য নিষ্কাসন করা সম্ভব নয়। গাণিতিক সংজ্ঞাই হয়তো এই সব ধারণাসমূহকে স্বয়ং নির্ভর গাণিতিক ধারণায় রূপান্তরিত করে এবং তারপর কোন তত্ত্ব নির্গলিত করে থাকে। হয়তো এই সংজ্ঞার জন্যই এই সব গাণিতিক ধারণা বিমূর্ত গাণিতিক ধারণার পর্যবসিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সংহতি ও সাধিত সংহতির (derived set) সমন্বয় সর্বদাই রুদ্ধ হবে' তত্ত্বটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এখন এই গাণিতিক চিন্তার মধ্যে অনেক কিছু গাণিতিক চিন্তা সুপ্ত অবস্থায় আছে। যেমন পরিণাম বিন্দুর (limiting point) সংজ্ঞা, রুদ্ধ সংহতির (closed set) সংজ্ঞা ইত্যাদি এর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। ফলে বিমূর্ত গাণিতিক ধারণার কথা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে।

গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে জটিলতা তার জন্য অনেকাংশে বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তাধারা দায়ী। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন বিমূর্ত গাণিতিক ধারণার জন্য যে সময় ও শ্রম ব্যয় করা হয় তার সঠিক মূল্যায়ণ অনেক ক্ষেত্রে হয় না। অনেকে অবশ্য বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তাকে (ভাবনাকে) গাণিতিক চেতনার (concept) ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী একথা স্বীকার করেন না। এঁদের ধারণা যার ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই অথবা থাকলেও তাৎক্ষণিক প্রয়োগ নেই সেই সমস্ত গাণিতিক চিন্তাধারার প্রয়োজন কি? বলা বাহুল্য এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তাধারাকে আমল দিতে চান না। ফলে জাতীয় বিজ্ঞান নীতি ইত্যাদিতে এর আকর্ষণ ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। মনে হয় বিমূর্ত গাণিতিক ধারণাই সাধারণ মানুষ এবং প্রকৃত গণিতবিদদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনেছে। যে সমস্ত গণিতজ্ঞদের চিন্তাধারায় বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তাধারার প্রভাব

পড়ে না তাঁরা গণিতবিদ হিসাবে কতটা সাফল্যলাভ করবেন তা বলা কঠিন। বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তাধারায় অনেক সময় সাধারণ চিহ্নের ব্যবহার বা তার প্রয়োগ আমাদের নজরে পড়েনা। এই যথার্থ স্বাতন্ত্রবোধই প্রকৃত গণিতবিদের সঙ্গে সাধারণ চিন্তাশীল মানুষের সঙ্গে পৃথক করে রেখেছে। গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সাধারণের যে ধারণা বা বোধ তা কিছুটা সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যে বাঁধা। কোন রকম গাণিতিক বিমূর্ত চিন্তাধারার সাহায্যে তাঁদের গাণিতিক চিন্তাশক্তিকে ধারালো বা সম্প্রসারিত করার মতো কোন মনোবৃত্তি তাঁদের নেই। যে সমস্ত গণিতবিদদের গাণিতিক চিন্তাধারায় গাণিতিক স্বজ্ঞা বা সত্তা নিহিত আছে তাঁরাই বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তা করতে পারেন। বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তা তখনই সাধারণের নিকট বোধগম্য হয় যখন কতকগুলি বিশেষ গাণিতিক চিন্তাকে একটি স্বজ্ঞাপ্রসূত গাণিতিক ধারণায় আবদ্ধ হয়ে তার প্রত্যেকটির কোন একটিকে তারা পৃথকভাবে গাণিতিক সত্তা হিসাবে নির্দেশ করে।

গাণিতিক চিন্তায় খুশীমতো ধারণা সৃষ্টি করা যায় না বা সুবিধামতো কোন গাণিতিক ধারণাকে পরিবর্তন করা যায় না। কারণ গাণিতিক ধারণা এমন একটি গাণিতিক সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত যা ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে অন্য একটি ধারণার জন্য পথ ছেড়ে দেয় না। এই গাণিতিক সত্তার ভিত্তি হচ্ছে নানা রকম বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির সংমিশ্রণ। একথা ঠিক গাণিতিক চিন্তা যতই বিমূর্ত হবে ততই ভৌত পর্যবেক্ষণজাত গাণিতিক চিন্তার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। বলা বাহুল্য বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তার উৎসস্থল হচ্ছে মননের অত্যন্ত গভীর স্থল থেকে যা পছন্দ বা অপছন্দের উপর নির্ভরশীল নয়।

গাণিতিক ধারণার মধ্যে অনেকগুলি এমন ধারণা আছে যা চিত্রের সাহায্যে বা সহজ পর্যবেক্ষণের ফলে ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা যদি এই ধরণের গাণিতিক ধারণাকে ইন্দ্রিজাত গাণিতিক ধারণা বলে থাকি তাহলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই গাণিতিক ধারণা বিমূর্ত গাণিতিক ধারণা থেকে শক্তিশালী, সতেজ ও সুস্পষ্ট। তাছাড়া এই ধরণের ইন্দ্রিজাত গাণিতিক ধারণার একটা দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি আছে। কিন্তু বিমূর্ত চিন্তাধারা অনেক সময় অনিয়মিতভাবে সৃষ্টি হয় কিন্তু একটা নিয়মিত ধারণা বা অনুক্রম

আছে যার বিস্ময়কর সংযুক্তি গণিতবিদের প্রজ্ঞা ও উপচিকীর্ষার যথেষ্ট প্রমাণ। যে সব নির্দিষ্ট নিয়ম ও অনড় পদ্ধতির সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গাণিতিক ধারণা বা চেতনা আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে তাকে যুক্তিগ্রাহ্য অবরোহ বা আকারনিষ্ঠ গাণিতিক চিন্তা বলতে পারি। এই ধারণা স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গাণিতিক চিন্তায় এক রকম পরিণামদর্শিতার সন্ধান পাওয়া যায় যার সাহায্যে তথাকথিত গাণিতিক চিন্তাধারা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। হয়তো এছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। যোগে বৃদ্ধি ইত্যাদির ধারণা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের উপযোগী। নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গাণিতিক চিন্তা থেকে এগুলির উৎপত্তি একথা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। হয়তো বা আমাদের যে গাণিতিক ধারণা রয়েছে তার মধ্যে অপরিহার্য কোন সম্বন্ধ আবিষ্কারের ফলে এগুলি পেতে পারি। এ সম্ভাবনা যদি না থাকতো তাহলে গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। ফলে হয়তো গাণিতিক চিন্তার মৃত্যু ঘটতো। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গাণিতিক চিন্তা অনেক সময় মূল গাণিতিক চিন্তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ অনেক সময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণার পিছনে আরও কতকগুলি ধারণার সমাবেশ হয় যা গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে যদি যে গাণিতিক ধারণা আমাদের চিন্তার মধ্যে রয়েছে তার শক্তি ও কার্যকারীতা আরোপ করা যায় তাহলে এটি একটি অযৌক্তিক ও দুর্বোধ্য গাণিতিক ধারণায় পর্যবসিত হবে।

আমরা পূর্বেই বলেছি গাণিতিক চিন্তাধারা প্রথমে অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে অধিকাংশ গাণিতিক চিন্তা বিমূর্ত। হয়তো গাণিতিক চিন্তার মধ্যে পরস্পর বিরোধী ও স্বতন্ত্র যে দুটি কল্পনা থাকে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টাও হয়ে থাকে। তবে এই চেষ্টার সাফল্য কখনও আংশিক কখনও পূর্ণভাবে দেখা যায়। গাণিতিক চিন্তাধারায় যে অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়ে থাকে তা হচ্ছে একদিকে গাণিতিক সংবেদনের বৈচিত্র্য অন্যদিকে গাণিতিক ধারণার ঐক্যের মধ্যে সংযুক্ত। গাণিতিক সংবেদনের অনন্ত বৈচিত্র্যকে গাণিতিক ধারণার সুসংবদ্ধ করা যায় এ কথা সত্য কারণ গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতা বা সম্ভাবনা এই সংযোগের উপর

প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এই সংযোগ অত্যাশ্চর্য সে কথাও স্বীকার করতে হয়। গাণিতিক চিন্তার স্বাধীনতা ও কার্যকারণ স্থত্রের একাধিপত্য স্বীকার করে নিলেও এর মধ্যে কিছু সমস্যা নিহিত থাকে যেটি সমাধানে সচেষ্ট না হলে সমস্ত গাণিতিক চিন্তাধারাই অমূলক হয়ে পড়বে। অবস্য এই মিলনই গাণিতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে একটি নূতন দিক বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে দুটি ধারা বর্তমান। একটি হচ্ছে সার্বিক গাণিতিক চিন্তাধারা (generalisation) অন্যটি হচ্ছে বিশেষ গাণিতিক চিন্তাধারা (particuiar)। সার্বিক গাণিতিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষ গাণিতিক চিন্তাধারার সম্বন্ধ নির্ণয় করাও একটি উল্লেখযোগ্য গাণিতিক চিন্তা। অনেক গাণিতবিদ বিশেষ গাণিতিক চিন্তার সত্তাকে অস্বীকার করে সার্বিক গাণিতিক চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। আবার অনেক গণিতবিদ মনে করেন বিশেষ গাণিতিক চিন্তাধারা বঞ্চিত সার্বিক গাণিতিক চিন্তাধারা অর্থহীন। বলা বাহুল্য বিশেষ গাণিতিক চিন্তাধারা কিছুটা বাস্তব কিন্তু সার্বিক গাণিতিক চিন্তাধারা অনেকক্ষেত্রে বিমূর্ত। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে সার্বিক গাণিতিক চিন্তাধারা বা বিশেষ গাণিতিক চিন্তাধারা কোনটিকেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দুটির মধ্যে একটিকে অন্ততপক্ষে রহস্য বলে মনে হতে পারে। বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তাধারার ভিত্তি হচ্ছে বুদ্ধি। এই বুদ্ধির ধারণা সর্বদাই সার্বিক। অন্যপক্ষে গাণিতিক সংবেদন সর্বক্ষেত্রে বিশেষ। সেইজন্য গাণিতিক সংবেদনের সঙ্গে গাণিতিক ধারণার সম্বন্ধ নিয়েও সমস্যা দেখা যায়। অনেক গাণিতিক চিন্তাধারার মধ্যে গাণিতিক স্বজ্ঞা (intution) বা সত্তা (entity) অপরিহার্য একথা বহু গাণিতিক মনে মনে স্বীকার করেন তবে প্রশ্ন থেকে যায় এর ভিত্তি কোথায়? কার্যকারণ বোধ না থাকলে হয়তো হেত্বার্থক গাণিতিক চিন্তাধারা থাকতে পারে না। সমস্ত গাণিতিক সংবেদনা দেশ কালজ। স্থতরাং এইহেতু বলা যেতে পারে সমস্ত গাণিতিক সংবেদনই কার্যকারণ স্থত্রের অধীন। কিন্তু গাণিতিক সংজ্ঞা বা সত্তার বিবরণ কার্যকারণ স্থত্রের মধ্যে স্থস্পষ্টরূপে দেখা যায় না।

বিশেষ গাণিতিক চিন্তা এবং সার্বিক গাণিতিক চিন্তার মধ্যে যে সমস্যা আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই তা কতটা গাণিতিক সংজ্ঞা বা সত্তার উপর নির্ভরশীল তা বলা কঠিন। আমরা উপলব্ধি করি যে সার্বিক গাণিতিক

চিন্তা ব্যতীত বিশেষ গাণিতিক চিন্তার কোন সত্তা নেই। বিশেষ গাণিতিক চিন্তার সমস্ত গুণলক্ষণ সার্বিক গাণিতিক চিন্তারই আত্মপ্রকাশের ফল একথা স্বীকার করে নিলে গাণিতিক চিন্তাধারার অনেক বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঘটবে। বিশেষ গাণিতিক চিন্তার স্বতন্ত্র সত্তাকে অনেক সময় চরম মনে করা হলেও সার্বিক গাণিতিক চিন্তাধারা ও বিশেষ গাণিতিক চিন্তাধারার মধ্যে সম্বন্ধ দুর্জ্ঞেয় বা রহস্যময় নয়। কারণ বিশেষ গাণিতিক চিন্তাধারায় যে বিশেষত্ব সেই গুণলক্ষণগুলি সার্বিক গাণিতিক চিন্তাধারায় সব সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভেবে থাকেন কার্যকারণ সূত্র এবং বিশেষ গাণিতিক চিন্তার মধ্যে একই ধরণের সমস্যা নিহিত। হয়তো এ সমস্যা গাণিতিক সত্তার যে বৈচিত্র্য তার উপর নির্ভরশীল।

লক্ষ্য করলেই দেখা যায় গাণিতিক চেতনায় বা চিন্তায় যে স্বাধীনতা আছে তার সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রের একাধিপত্যের সমন্বয় ঘটানোর সম্ভাবনা অনেক সময় করা হয়। কারণ বিশেষ গাণিতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যকেও গাণিতিক চেতনার বা চিন্তার স্বাধীনতার প্রকারভেদ বলে মনে করা যায়। একথা ঠিক যতই আমরা বিশেষ গাণিতিক চিন্তা এবং সার্বিক গাণিতিক চিন্তার মধ্যে একটি পার্থক্যের সীমারেখা টানি তবুও এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। বিশেষ গাণিতিক চিন্তা সার্বিক গাণিতিক চিন্তার প্রতিচ্ছায়া (অথবা সার্বিক গাণিতিক চিন্তা বিশেষ গাণিতিক চিন্তার প্রতিচ্ছায়া)। কেবলমাত্র বিশেষ গাণিতিক চিন্তার স্বভাব বিচার করে সার্বিক গাণিতিক চিন্তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। বিশেষ গাণিতিক চিন্তার স্বভাবে প্রকাশিত হয়েও এই সার্বিক গাণিতিক চিন্তা স্বাধীন। অথচ সার্বিক গাণিতিক চিন্তার (Universal Mathematical Concept or thought) এই স্বাধীন গাণিতিক সত্তা তার বিশেষ গাণিতিকরূপের ব্যতিক্রম মনে করা চলে না। সার্বিক গাণিতিক চিন্তা বিশেষেরই সার্বিক। কিন্তু তবুও কেবলমাত্র বিশেষ গাণিতিক চিন্তার স্বভাব বিচার করে আমরা সার্বিক গাণিতিক চিন্তার স্বভাবের কোন পরিচয় সর্বদা পাই না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—ধরা যাক পরিণাম বিন্দুর সংজ্ঞা (definition of a limiting point) পরিণাম বিন্দুর সার্বিক সংজ্ঞায় কোন দ্বিমত নেই কিন্তু সার্বিক সংজ্ঞায় এর বিশেষত্ব খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। সার্বিক গাণিতিক সংজ্ঞায়

পরিণাম বিন্দুর মূল সংজ্ঞা একটি অথচ বিশেষ বিশেষ দেশে (space) এর সংজ্ঞা বিভিন্ন। যেমন দীঘল দেশে (metric space) পরিণাম বিন্দুর যে সংজ্ঞা টপলজীয় দেশে (Topological space) সেই সংজ্ঞা খাটে না। আবার হিলবার্ট দেশে (Hilbert space) ভিন্ন সংজ্ঞা। অর্থাৎ বিভিন্ন কাঠামোতে বা দেশে পরিণাম বিন্দুর বিভিন্ন সংজ্ঞা থাকবে এবং আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। অবশ্য এই পার্থক্যের জন্য পরিণাম বিন্দুর গাণিতিক সত্তার কোন পার্থক্য নেই। এখানে স্বভাবের ঐক্যই এই গাণিতিক চিন্তাধারার প্রকৃত স্বরূপ।

সার্বিক গাণিতিক ধারণা থেকে কি করে বিশেষ গাণিতিক ধারণায় রূপান্তরিত হয় তার চেয়ে গাণিতিক সংজ্ঞাপ্রসূত ধারণা উপলব্ধি করা অনেক সহজ। যদি কোন গাণিতিক সংজ্ঞাকে কোন একটি নূতন সূত্রে ব্যবহৃত হতে দেখতে চাই তাহলে এই প্রসঙ্গে যে গাণিতিক ধারণা আমাদের মনে উদিত হয় তা বিশেষ গাণিতিক ধারণা হয়েও সার্বিক ধারণার পর্যবসিত হয়। তখন এই গাণিতিক ধারণার সাহায্যে একই রকমের আরও কিছু নূতন গাণিতিক ধারণার প্রতিনিধিত্ব করান যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যটি পরিষ্কার করে তুলে ধরছি। ধরা যাক কোন গাণিতবিদ একটি কোণকে সমান দুভাগে ভাগ করার পদ্ধতি দেখাচ্ছেন। তিনি প্রথমে পছন্দ মতো 30° কোণ আঁকলেন। এই অঙ্কিত কোণটি একটি বিশেষ কোণ। কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে এটি সার্বিক। কারণ সমস্ত বিশেষ কোণের প্রতিনিধি হিসাবে এটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে এ বিষয়ে প্রমাণিত সবকিছু গাণিতিক চিন্তা তা সমস্ত কোণ সম্পর্কে প্রযোজ্য অথবা অন্য কথায় বলা যায় সার্বিক কোণ সম্পর্কেও এটি প্রযোজ্য। পূর্বেরটি তার সার্বিকত্ব পাচ্ছে কোন একটি পৃথক বা সার্বিক কোণের চিহ্ন থেকে নয়, পাচ্ছে সমস্ত সম্ভাব্য কোণের চিহ্ন থেকে। একইভাবে বলা যায় শেষেরটি সার্বিকত্ব পেতে হবে ঐ একই কারণ থেকে অর্থাৎ যে সব রকমারি বিশেষ কোণ সে নিরপেক্ষ-ভাবে নির্দেশ করে তার থেকে।

আমরা পূর্বেই গাণিতিক সংজ্ঞার কথা বলেছি। তবে এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা আমরা করি নি। এবার এনিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। কোন বিশেষ গাণিতিক চিন্তায় বার বার একই গাণিতিক ধারণাসমূহের সন্নিবেশ না ঘটিয়ে একটি পারিভাষিক শব্দ (Technical term) যদি ব্যবহার

করা হয় তাহলে ঐ পরিভাষিক শব্দকে গাণিতিক সংজ্ঞা বলা হয়ে থাকে। এবং বলা যেতে পারে গাণিতিক ধারণাসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য গাণিতিক সংজ্ঞার উৎপত্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনাটিকে কিছুটা রসগ্রাহী করা যাক। সংহতির বেষ্টনীর সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা যাক (definition of a closure of a set)। মনে করা হলো A একটি সংহতি। A-র রুদ্ধ অধি সংহতিসমূহের ছেদকে A সংহতির বেষ্টনী বলা হয়। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে রুদ্ধ অধি-সংহতির ধারণা আবশ্যক। যদি এটিকে সংহতির বেষ্টনীর সংজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় তাহলে এটি একটি গাণিতিক সংজ্ঞার পরিভাষা। আবার এই গাণিতিক সংজ্ঞার জন্য পরিণাম বিন্দুর ধারণা (Concept of a limiting point) আবশ্যক। কারণ আমরা জানি যে সংহতিতে পরিণাম বিন্দু অবস্থান করে সেই সংহতিটিকে রুদ্ধ সংহতি (closed set) বলা হয়। আবার আমরা নূতন একটি গাণিতিক ধারণার সম্মুখীন হলাম। অর্থাৎ পরিণাম বিন্দুর সংজ্ঞার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমরা জানি যখন কোন বিন্দুর (বা উপাদানের) প্রতিবেশী অঞ্চলে কোন সংহতির অসীম সংখ্যক উপাদান (বা সদস্য) অবস্থান করে তখন ঐ বিন্দুটিকে ঐ সংহতিটির পরিণাম বিন্দু বলা হয়ে থাকে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি প্রতিবেশী অঞ্চলে সসীম বা অসীম সংখ্যক সদস্য অবস্থান করতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে বৈশিষ্ট্যের তাগিদেই পরিণাম বিন্দুর সংজ্ঞার আবশ্যক হলো। তাহলে আমরা বলতে পারি গাণিতিক চিন্তাসমূহের বিভিন্ন ধারণার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন গাণিতিক সংজ্ঞার উৎপত্তি হচ্ছে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেশ কিছু গাণিতিক চিন্তাকে গাণিতিক ধারণা না বলে গাণিতিক সংজ্ঞা আমরা বলে থাকি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দুটি ব্যাখ্যার কথা সহজেই মনে আসে। প্রথমতঃ গাণিতিক ধারণা শব্দটি দিয়ে সাধারণ উপলব্ধিজাত কোন একটি গাণিতিক চিন্তাকে বোঝান হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ গাণিতিক সংজ্ঞার চেয়ে গাণিতিক ধারণার তাৎপর্য অনেক বেশী ব্যাপক। গাণিতিক সংজ্ঞার সঙ্গে চিন্তাশক্তিসম্পন্ন গাণিতিক ধারণাও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ গাণিতিক সংজ্ঞার মধ্যে গাণিতিক ধারণা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মিশে থাকে কিন্তু গাণিতিক ধারণার মধ্যে গাণিতিক সংজ্ঞা নাও মিশে থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন গাণিতিক

সংজ্ঞা গাণিতিক ধারণাসমূহের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলির বিশ্লেষণে সাহায্য করে। বিশেষ গাণিতিক ধারণা যখন আমাদের মনে উঁকি দেয় তখন সংজ্ঞা এই ধারণাকে অন্য সব গাণিতিক ধারণা থেকে পৃথক করে তোলে এবং তারই মধ্যে বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তাধারায় অনেক সময় উপলব্ধি-জনিত ব্যাখ্যাই প্রয়োজন হয়। গাণিতিক সংজ্ঞা অনেক সময় নিজের মধ্যে গুণ বা ধর্মের পৃথক ধারণা সৃষ্টি করে এবং এই নূতন ধারণাকে স্বীকার্য (axiom) বলে ধরে নিতে আমাদের মনে দ্বিধা জাগে না। গাণিতিক স্বীকার্য অনেক সময় দুটি তত্ত্বের মধ্যে কোথায় মিল বা কোথায় অমিল সে সম্পর্কে যে গাণিতিক চিন্তা তাতে আলোকপাত করতে পারে। ফলে প্রত্যেকটি গাণিতিক তত্ত্ব স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হয়।

সব কিছু দেখে মনে হয় গাণিতিক সংজ্ঞা এমন একটি চিন্তা যার দ্বারা নিজের স্বরূপ বা প্রকৃতি নিজেই ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। গাণিতিক সংজ্ঞা আত্মজ। অনেক সময় অন্য একটি গাণিতিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সহায়তা করে অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় আত্মজ গাণিতিক সংজ্ঞার মধ্যেই লীন হয়ে যায়। সুতরাং গাণিতিক চিন্তার বিষয়বস্তু পরীক্ষা করে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে এই বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে গাণিতিক ধারণাবোধ (Conception) অন্যতম। হয় এই ধারণাবোধ কোন ভৌত পর্যবেক্ষণের ফলে উদ্ভূত নয়তো মনের মধ্যে যে গাণিতিক সত্তা রয়েছে তা থেকে উদ্ভূত। যে সব গাণিতিক ধারণাবোধ মূলত এই প্রকারে অনুভূত সেই অনুভূত ধারণাবোধের সঙ্গে স্মৃতি ও কল্পনার সাহায্যে এবং গাণিতিক যুক্তির বা গাণিতিক সত্তার সাহায্যে এমন একটি গাণিতিক চিন্তনের সৃষ্টি করা হয় যা পরবর্তী কালে এক অপূর্ব অথচ বিমূর্ত গাণিতিক ধারণায় রূপান্তরিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজ ও গণিত

কোন ভারতীয় গণিতবিদ যখন তাঁর জার্মান বন্ধুর কোন গাণিতিক প্রবন্ধ পাঠ করেন তখন লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যাবে ভারতীয় গণিতবিদ জার্মানী বা ঐ প্রবন্ধের লেখক সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছেন। যদি প্রবন্ধের ভাষা সুগম্য হয় এবং প্রচলিত রীতিনীতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহলে হয়তো একটি গাণিতিক বন্ধনের সূত্রপাত হবে। কথিত প্রবন্ধটি হয়তো ভারতীয় গণিতবিদের নূতন চিন্তাধারার একটি উৎস বলা যেতে পারে এবং তিনি তাঁর চিন্তাধারায় কিভাবে উক্ত প্রবন্ধটির তত্ত্ব বা নির্যাস সংযোজিত করা যেতে পারে সে কথাই অহরহ ভাববেন। গাণিতিক কর্মযজ্ঞে ঠিক এ ধরণের মনোবৃত্তি অনেক সময় সামাজিক ও মানবিক সত্তাকে বঞ্চনা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় প্রবন্ধকার জীবিত কি মৃত বা তাঁর অবস্থা কেমন এসব প্রশ্ন সম্পর্কে সাধারণতঃ উদাসীন থাকা হয়। কিন্তু প্রবন্ধটির অন্তর্গত তত্ত্বটি অতিশয় সুন্দর ও প্রয়োজনীয় এ মত আমরা পোষণ করে থাকি। এ থেকে স্পষ্টই অনুধাবন করা যায়—গণিতবিদরা যে সমাজে বাস করেন সে সমাজ গণিতজ্ঞদের নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু যেহেতু তাঁর বা তাঁদের প্রবন্ধসমূহ প্রকৌশলীবিদ্যায় (Technological) আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে এবং হয়তো সামাজিক পরিবর্তনেও সক্ষম সেই হেতু প্রবন্ধসমূহের যথোপযুক্ত মূল্যায়ণ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রবন্ধটির একটি সামাজিক মূল্যও নির্ধারিত হোয়ে থাকে। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির জলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে নরওয়ের তরুণ গণিতবিদ নীল হেনরিক এ্যাবেল এবং ফরাসী তরুণ গণিতবিদ এভারিস্তে গ্যালয়ি। যদি সংখ্যাতত্ত্বের ক্রমবিকাশে বীজগাণিতিক সমীকরণের পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যায় তা হোলে দেখা যাবে এঁদের দুজনের গবেষণা আমাদের এখনও অভিভূত করছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে। কিন্তু আমরা জানি এ্যাবেল ও গ্যালয়ি অপরিণত বয়সে মারা যান। এ্যাবেল ছিলেন গরীব, কখনও অর্ধাহারে কখনও অনাহারে দিন কাটিয়েছেন। ফলস্বরূপ যক্ষার প্রকোপে পড়ে মারা যান। গ্যালয়ি কিছুটা বোকামীর জন্য অকালে ঝরে পড়েন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ এঁদের জন্য কি করতে পারত ? সমাজ ইচ্ছা

করলে এ্যাবেলকে কোন নামকরা চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করতে পারতো এবং সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে আবার যাতে গণিত চর্চা করতে পারতেন সেদিকে নজর দিতে পারতো। গ্যালয়ির ক্ষেত্রে হয়তো কন্‌সেনট্রেশন্ ক্যাম্প বা কারাগারে পাঠিয়ে অথবা এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হোত যার ফলে গ্যালয়ি শুধরে যেতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোন ব্যবস্থাই সমাজ এঁদের জন্য নেয়নি। বলা বাহুল্য, সমাজ এঁদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যসমূহের সুফলটুকু ভোগ করতে সদাই প্রস্তুত। সবকিছু দেখে মনে হয় গণিতজ্ঞরা সত্য উদ্ঘাটন করবেন এবং সভ্যতাকে গাণিতিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করবেন কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে সমাজ চিরকাল উদাসীন থাকবে।

গণিতবিদরা তাঁদের পূর্বসূরীদের গবেষণাকার্য আরও যত্নসহকারে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান যার ফলে তাঁদের উপর পূর্বসূরীদের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। অনেক সময় এঁরা ইচ্ছানুযায়ী সত্তা সৃষ্টি করেন। উপযুক্ত বিবেচনা করে সংজ্ঞা দেন এবং সেই জন্যই অনেক সময় মনে হতে পারে যান্ত্রিক পর্যায়ে এঁদের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত এবং ন্যায়ভিত্তিক হেতু একটি সুন্দর বচনমালায় পরিণত হয়। এই বচনমালা শেষ পর্যন্ত একটি তত্ত্বের রূপ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। এ যেন মনে হয় গণিতবিদরা বিশ্ব ক্রীড়ায় রত। তাঁরা সনাতন সত্যের মাধ্যম দিয়ে একটি বিশ্ব চেতনাকে অন্য একটি বিশুদ্ধ চেতনায় সংক্রমিত করছেন। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে আমাদের ধারণা জন্মায় গণিত হচ্ছে ইচ্ছানুযায়ী প্রচলিত ভিত্তির উপর রচিত যুক্তিশাস্ত্র সম্মত অনুধ্যানের সীমাহীন ক্রমবিকাশের চেয়ে বেশী কিছু নয়। গণিতস্রষ্টা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতকে নিয়ে খেলা করেন ফলে অনেক সময় একঘেয়েমি তাঁকে পেয়ে বসে। সাধারণতঃ এক্ষেত্রে ভাবা হয় স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি থেকে সাময়িক বিরত থাকেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়।

যদি গণিতের ক্রমবিকাশকে তার প্রসঙ্গ ও পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করা যায় তাহলে এ আলোচনা মূল্যবান হবে না পরন্তু জটিল হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে মানব সভ্যতার বিবর্তনকে সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত করতে পারবে না। ফলস্বরূপ আমরা যা আলোচনা করতে চলেছি তা হবে বিকৃত ও উদ্দেশ্যহীন। গণিতের ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গেলে মানসিক ও সামাজিক দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। কারণ গণিতজ্ঞরা যে গাণিতিক সমাজকে

এগিয়ে নিয়ে যান তা ধরতে গেলে সামগ্রিকভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। যদি সামাজিক ও গাণিতিক ক্রমবিকাশকে একত্রিত করে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে এর কার্যকারীতার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহহীন হতে পারা যায়। কারণ কার্যকারীতার সাফল্য প্রকৌশলী প্রয়োজনভিত্তিক। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে গণিত সমসাময়িক সভ্যতার মৌলিক আদর্শের একটি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। আমাদের দেখা দরকার গণিত সমাজে কি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে গণিতের ক্রমবিকাশ হয় কিভাবে ?' সমাজের উন্নতি ও চাহিদার উপর নির্ভর করেই হয়তো গণিতের উৎপত্তি। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন জীবনের পার্থিব চাহিদা এবং কিছু কিছু সমাজের প্রকৌশলী বিদ্যা এমন একটি স্তরে পৌঁছেছিল যার পরিনামে গণিতের জন্ম। গণিতের আদি স্তর হয়তো এখনকার মত এতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। ধরতে গেলে গণিতের আদি যুগ ছিল অনুমানভিত্তিক। পরীক্ষামূলক স্তর সোজা কথায় যাকে ভৌতবিজ্ঞান বলে সেই পর্যায়ে পৌঁছায় অনেক দেরীতে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে পূর্ণ সংখ্যার কথাই প্রথমে মনে আসে। প্রথমে মানুষ চারের বেশী গুণতে পারতো না। তারপর প্রকৌশলী চাহিদার জন্য বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার উদ্ভব হয়। মনে হয় কোন সরল রাখাল বালক তার পালে বহু সংখ্যক পশু গণনার জন্যই হয়তো কোন কৌশল অবলম্বন করেছিল যার ফলে সংখ্যা ও পশুদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এবং এর ফলেই বৃহৎ সংখ্যার ধারণা মানব মনে উদয় হয়। সামাজিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কথা সহজে মনে আসে। এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য পঞ্জিকার প্রয়োজন এবং তত্ত্ব ও তথ্যাদির জন্য সংখ্যার ধারণা থাকা আবশ্যক। মানব জাতি পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য জ্যোতিবিদ্যার চর্চা করতে থাকে যার ফলে গণিতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এরপর মানব জাতির সাজ সজ্জা, যন্ত্রপাতি, চিত্রশিল্প প্রভৃতিতে গণিত তথা জ্যামিতি শাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ হতে দেখা যায়।

গণিতের ক্রমবিকাশে বাণিজ্যভিত্তিক সমাজের প্রভাব বেশ কিছু রয়েছে। বাণিজ্যভিত্তিক সমাজের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আমাদের ধনতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে এই বাণিজ্যভিত্তিক সমাজ যা মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির

বনিয়াদ রচনা করেছিল। বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী অর্থনীতি কতকগুলি প্রকৌশলী সমস্যার উপর নির্ভরশীল। এবং প্রকৌশলী সমস্যা মানব চিন্তাধারায় কিছুটা অভিঘাত সৃষ্টি করে। এ ধরণের অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন গাণিতিক পদ্ধতি, নৌবহ বিজ্ঞান, পরিবহন প্রভৃতি এবং এগুলির জন্য পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান বলবিদ্যা প্রভৃতির চর্চা ও ক্রমবিকাশের প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন মিশর ও ব্যাবিলনে পাটীগণিত ও জ্যামিতির উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল। তাছাড়া ভারতবর্ষে প্রাক বীজগাণিতিক ও বীজগাণিতিক চিন্তার উন্মেষ কিভাবে হয়েছিল তাও আমাদের অজানা নয়। প্রতি বছর নীলনদে বন্যা দেখা দিত। বন্যার প্রকোপ কমে গেলে দেখা যেত নীলনদের উপকূলবর্তী অঞ্চলে পলি পড়ে আছে। ফলে আবার নূতন করে জমি জরিপ করবার প্রয়োজন হ'ত। আবার মিশরে পিরামিডের মতো বৃহৎ বৃহৎ সূর্য ফলক নির্মাণ করা হ'ত। পিরামিড নির্মাতাগণ চুনা পাথরের টুকরোগুলিকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে নিত তারপর প্রয়োজন মতো স্থাপন করতো। এ থেকে বোঝা যায় কিছুটা সামাজিক ও অর্থনীতির প্রয়োজনে জ্যামিতি তথা গণিতের ক্রমবিকাশ মিশরে ঘটেছিল। পরবর্তী কালে এ সমস্ত দেশে গণিতের ক্রমবিকাশ ঘটলেও গণিতের প্রকৌশলী ব্যবস্থা কিছুটা জটিল হয়ে পড়ে যার ফলে গণিত চর্চা একমাত্র বিশেষজ্ঞদের চর্চার বিষয় বলে অনুভূত হতে থাকে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় এই সমস্ত বিশেষজ্ঞরা শাসকশ্রেণীর চতুর্দিকে ভীড় জমাতে থাকে এবং এর পর থেকে গণিতশাস্ত্র গুপ্ত রহস্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে থাকে। যাঁরা এই গুপ্ত রহস্যের চাবিকাঠি পেলেন তাঁরা ধীরে ধীরে ক্ষমতাবান এবং গণিতের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার লাভ করতে থাকেন। বলা বাহুল্য মিশরে এই জন্যই পুরোহিত তন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ গণিতের ক্রমবিকাশের জন্য একটা নূতন জাতি বা সমাজ গঠিত হয়েছিল যাকে আমরা পুরোহিত সমাজ বলে অভিহিত করে থাকি। গণিতের দুর্জ্ঞেয়ত্ব ও গুপ্তরহস্য সম্ভূত বিস্তারের জন্য দুর্জ্ঞেয় সংখ্যা ও আকারের ক্রমবিকাশ ঘটে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী ও চীনাদের মধ্যে এ ভাবধারা সীমাবদ্ধ ছিল। অনেকে এ ভাবধারাকে সামঞ্জস্যহীন বলে থাকেন। এঁদের অনুমান সর্বাংশে সঠিক এ কথা জোর করে বলা যায় না। কারণ হিসাবে বলা যায় পীথাগোরীয় দুর্জ্ঞেয় সংখ্যা (অতীন্দ্রিয় সংখ্যা) গ্রীক বিজ্ঞান

ও দর্শনে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এবং পুরুষানুক্রমে আমাদের সময়েও প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম। মিশরীয় পেপিরাস গ্রীক চিন্তাধারায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রকৌশলী ও অর্থনৈতিক কাঠামো সংক্রান্ত সমাজের উদাহরণ এই গ্রীক সমাজ। এ সমাজ বাণিজ্যভিত্তিক ও দাস ভিত্তিক ছিল। অবশ্য সমাজের আভিজাত্য ও গণিতন্ত্রের ধ্বজাধারীরাই এ সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করতো। এবং এর উন্নতির জন্য প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নতির প্রয়োজন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এ ধরণের সামাজিক কাঠামো গ্রীক গণিতশাস্ত্রে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গিয়েছে। আলেকজান্দ্রিয়াতে যে সমস্ত গ্রীক বাস করতেন তাঁদের সামাজিক পরিবেশ আরও বেশী বাণিজ্যভিত্তিক ও যান্ত্রিকভাব ধারায় উদ্ভূত। অবশ্য এঁরা প্লেটোর কালের চিন্তাধারার মতই সংস্কার ও ট্রাডিশনকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। অনেক সময় সমাজের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এঁরা এঁদের গাণিতিক চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আর্কিমিডিসের কথা। ইনি আলেকজান্দ্রীয় স্কুলের মতধারায় নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন এবং শহরের সামাজিক রীতিনীতির দিকে নজর রেখেই তাঁর গাণিতিক চিন্তা পদ্ধতিকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। ধরতে গেলে এই চিন্তা-ধারাকে আধুনিক যুগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক গণিত ও জ্যামিতির পাঠই বাণিজ্য ভিত্তিক সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করেছিল। গাণিতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছে ঋণী এ ধারণা অনেকের মনে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী বলা যায় প্রাচীন ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে গ্রীকদের কোন প্রভাব নেই। অমূলদ রাশি সম্পর্কে গ্রীকদের সংস্কার ছিল কিন্তু ভারতীয়রা এ ব্যাপারে সংস্কারমুক্ত ছিলেন। তাঁরা (ভারতীয়রা) গাণিতিক 'পদ্ধতিতে বীজগণিতের নানা কলা কৌশল ব্যবহার করতে থাকেন। এ সব কিছুকে বাদ দিলেও ভারতীয়দের মহৎ আবিষ্কার হচ্ছে—শূন্য প্রতীক এবং তার ধারণা। অনেক ঐতিহাসিক অবশ্য বলে থাকেন শূন্যের প্রাথমিক চিন্তাধারা হয়তো ব্যাবিলনবাসী এবং মায়াদের মধ্যে ছিল তবে তাঁরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন ভারতীয়রাই এটিকে সূত্রায়িত করেন। সমগ্র বিশ্বকে ভারতীয়রা একটি গাণিতিক প্রকৌশলী ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে—যেটি বিশ্লেষণাত্মক গণিতে

একটি সাহায্যকারী ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। ভারতীয় গণনা পদ্ধতি মুসলীম বিশ্বে প্রবেশ করে। এই বিশ্ব বাণিজ্য ভিত্তিক সভ্যতার একটি জলন্ত উদাহরণ। ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় গণনা পদ্ধতিকে বেশ সুনজরেই দেখতো এবং এর ফলেই এই পদ্ধতি মুসলীম বিশ্বের সহায়তায় ইউরোপে প্রবেশাধিকার পায়। এরপর ইউরোপ গণিতের ক্ষেত্রে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। বাণিজ্যিক গণিতের উপর 1228 খ্রীষ্টাব্দের পিসার লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ তখন সমাজে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ফলে মানুষ ভাবতে সুরু করেছিল—গণিত তথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও কি ভাবে উন্নতি করা যায় এবং সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কি করে। এরপর মুদ্রণ ব্যবস্থা আবিষ্কারের ফলে বহু গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের হাতে গিয়ে এগুলি পড়ে। এইভাবে অতি ধীরে গণনা পদ্ধতি ও লেখ্য পদ্ধতির ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। ধরতে গেলে সামাজিক পরিবর্তনের চাপে এই ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। স্বভাবতই এই পরিবর্তনের অনিবার্য তৎপরতার অনুপ্রেরণার উৎস কোথায় এবং কারা এ ব্যাপারে পথিকৃত সে প্রশ্ন আমাদের মনে সদাই অনুরণিত হতে থাকে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত গণিতশাস্ত্রে যুগসন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিল সামাজিক বিশৃংখলাতার জন্য। প্রাচীন বিশ্ব বিশেষ করে প্রাচ্য ও গ্রীকদেশ ইউরোপের অন্যান্য দেশকে জ্ঞানলোকে উদ্ভাসিত করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এইসব দেশে বৈপরীত্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রাচীনপন্থীরা গণিতের ক্ষেত্রে প্রচলিত চিন্তাধারা এবং তাদের নিজস্ব সুযোগ সুবিধাগুলি আঁকড়ে ধরতে চাওয়ায় নূতন চিন্তাকে তারা কাছে ঘেঁসতে দিত না, ফলস্বরূপ প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। মানুষের মধ্যে তখন ধীরে ধীরে যুক্তিবাদী চিন্তার উন্মেষ ঘটতে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে মুক্ত চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়। পরিণতিতে গড়ে ওঠে নানা বিশ্ববিদ্যালয়।

যুদ্ধের জন্য সমাজে একরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং এরই ঢেউ গণিতের ক্ষেত্রেও আছড়ে পড়ে। সমাজ যেমন গণিতবিদদের ব্যাপারে অনেক সময় উদাসীন। ঠিক আবার সামাজিক গোঁড়ামির জন্য গণিতের প্রসার ব্যাহত

হয়েছে। ভারতীয় পণ্ডিতেরা গোঁড়া ছিলেন। তাঁরা তাঁদের তত্ত্ব ও তথ্যাদি বহির্বিশ্বে প্রসার লাভ করুক সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের তথ্য বিদেশীদের শিক্ষা দিতে চাইতেন না। অবশ্য তাঁরা যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন তা বর্হিভারতে যেত এবং তা থেকেই বিদেশীরা ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানতে পারতো। কিন্তু অনেক সময় কাছে বসে শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বিদেশীরা অনুভব করতো কিন্তু ভাষা ও সামাজিক পরিবেশ এ ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো। অবশ্য সমাজের এ পরিবেশ হওয়ার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে সেই সময় ইসলাম ধর্ম ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে এবং তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এই রক্ষাকবচ। কিন্তু এ রক্ষাকবচে ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিশেষ করে গণিতচর্চা বিদেশীদের মধ্যে তেমন প্রসার লাভ করতে পারে নি। যেমনটি করেছিল গ্রীক গণিতশাস্ত্র তথা জ্ঞান বিজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আলবেরুনী ও তখনকার দিনে ভারতীয় পণ্ডিতদের মনোভাবের কথা উল্লেখ করতে পারি। একাদশ শতাব্দীতে কোন বিদেশীর পক্ষে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা হিমালয়ের মত দুর্ভেদ্য বর্ম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ বাধা অতিক্রম্ করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ ছিল না। অবশ্য এ ব্যবস্থা ভাষার তরফ থেকে আসে নি। এ বাধা এসেছিল সংস্কৃত ভাষাভাষী ভারতীয়দের অতিমাত্রায় রক্ষনশীলতা থেকে। ভারতীয় প্রজ্ঞার দিকে মুসলীম জগতের দৃষ্টি পড়ে, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ থেকে গণিতের উপর সামান্য প্রভাব পড়েছিল। তা ছাড়া অন্য বেশী কিছু ঘটতে পারে নি। পরে খলিফাদের চেষ্টায় জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ ও সুধী পণ্ডিতমণ্ডলী বাগদাদে নীত হলেও মুসলীম জগতের মানুষদের জ্ঞান পিপাসা তাতে বিশেষ নিবৃত্ত হতে পারে নি। তাই তাঁরা অনুবাদে মন দেন ও সংস্কৃত চর্চ্চা করতে থাকেন। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতেরা গোঁড়া থাকায় ভাষা ও ধর্মের প্রাচীর ভুলে ধরা হয়েছিল। হিন্দুরা গোঁড়া থাকায় বাইরের জ্ঞান বিজ্ঞান ও নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে মত বিনিময় হত না বললেই চলে। ফলে বিজ্ঞান তথা গণিতের চর্চা ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ভারতীয়রা ওয়াকিবহাল ছিল না। হিন্দু তথা ভারতীয় সমাজের এই অবস্থায় জন্য গণিতচর্চা বহুলাংশে ব্যাহত হয়।

গণিতবিদরাও বৃহত্তর সমাজকে বহুক্ষেত্রে বঞ্চিত করেছেন। এর জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ভারতীয় ব্রাহ্মণ সমাজ (আগেই বলা হয়েছে) ও পীথাগোরীয়

ভ্রাতৃসংঘ। আক্ষরিকভাবে না হলেও তাঁরা এক প্রকার সমবায় নীতি মেনে চলতেন! অবশ্য এটি তাঁদের সংঘের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা নিজেদের গাণিতিক ও সমষ্টিগত দার্শনিক চিন্তা দলীয় আবিষ্কার বলে মনে করতেন। এবং এঁরা গাণিতিক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলে অন্যত্র প্রকাশ করতেন না বা শিক্ষা দিতেন না। এ নিয়ে তাঁরা শপথ গ্রহণও করতেন। ফলে বৃহত্তর মানব-সমাজ প্রথম দিকে এই সংঘের আবিষ্কারের সুফল থেকে বঞ্চিত থাকতো। বলা যেতে পারে পীথাগোরীয় ভ্রাতৃসংঘ সমাজকে কিছুটা বঞ্চিত করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা এঁদের আবিষ্কৃত তথ্য যাঁরা প্রকাশ করতেন তাঁদের শাস্তি দেওয়া হ'ত। ঠিক এ ধরণের শাস্তি পেয়েছেন হিপাসাস। ইনি মেটাপনটাসের অধিবাসী ছিলেন। কতকগুলি গোপনীয় গাণিতিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্য এঁকে এই ভ্রাতৃ-সংঘ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এবং সম্ভবতঃ জলে ডুবিয়ে মারা হয়। ইনি $\sqrt{2}$ এবং $\sqrt{5}$ সম্পর্কিত কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। গণিতবিদদের এ হেন আচরণ সামাজিক ক্ষতিই করে থাকে। হয়তো আরও কিছু নূতন গাণিতিক তত্ত্ব আমরা হিপাসাসের কাছ থেকে আশা করতে পারতাম কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা অর্থাৎ সমগ্র মানব সমাজ ভ্রাতৃসংঘের গোঁড়ামীর শিকার হয়েছে।

জনতার রোষেও অনেক সময় গণিতজ্ঞরা লাঞ্ছিত ও মৃত্যুবরণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিপাটিয়ার কথা বলা যায়। জনতা ঢিল ছুঁড়ে এঁর মৃত্যু ঘটান। পৃথিবীর বরণীয়া গণিতজ্ঞার এই অকালমৃত্যু গণিত চর্চার ইতিহাসকে স্তব্ধ করতে না পারলেও হয়তো কিছুটা ব্যাহত করেছিল। সমাজের কঠিন কার্য-কলাপ অনেকসময় গণিতচর্চাকে ব্যাহত করে।

মানব সমাজে যুদ্ধ একটি বিশেষ ক্ষত। এই যুদ্ধের ফলে বহু সামাজিক ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুদ্ধের উন্মত্ততার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ আর্কিমিদিসের মৃত্যুতে। 212 খ্রীষ্টাব্দে সাইরাকিউস শহরে রোমান ও গ্রীকদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এই সময় একদিন আর্কিমিদিস নিজের ঘরে ধূলোয় উপর দাগ কেটে কোন জ্যামিতির তত্ত্ব আবিষ্কারে মগ্ন ছিলেন। রোমান যোদ্ধারা ঘরে ঢুকতেই আর্কিমিদিস চিৎকার করে বললেন —খবরদার আমার চিত্র নষ্ট করো না। রোমানরা আর্কিমিদিসকে চিনতে পারে নি। ফলে তারা আর্কিমিদিসকে নির্মমভাবে হত্যা করলো। ঠিক এইজন্যই আলফ্রেড হোয়াইটহেড বলেছিলেন রোমান সৈনদের হাতে আর্কিমিদিসের মৃত্যু

পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। কোন রোমকই গণিত-চিন্তায় মগ্ন থাকাকালীন নিহত হয়নি। বলা বাহুল্য সমাজ বা মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এই যে হানাহানির প্রবণতা রয়েছে তার ফলে গণিত তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। সমাজ যদি সচেষ্ট হ'ত তাহলে গণিত শাস্ত্রে এত বড় ক্ষতি হোত না।

আমরা এরপর আনাকজাগোরাসের কথা তুলে ধরতে পারি। ইনি গণিতবিদ ছিলেন এবং সেইজন্যই প্রচণ্ড যুক্তিবাদী ছিলেন। এথেন্সবাসীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করলেও ধর্মনিষ্ঠ সমাজ কিন্তু তাঁকে ভাল চোখে দেখতো না। তাছাড়াও আনাকজাগোরাস পেরিক্লিসের বন্ধু ছিলেন। পেলোপনেশিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে পেরিক্লিস জনগণের বিরাগভাজন হন। পেরিক্লিসের অন্যান্য বন্ধুদের সংগে আনাকজাগোরাসও কারারুদ্ধ হন। বহু চেষ্টার পর পেরিক্লিস আনাকজাগোরাসকে মুক্ত করেন কিন্তু নির্বাসন থেকে বাঁচাতে পারেন নি। আনাকজাগেরাসের প্রতি ধর্মান্ধ সমাজের এ ব্যবহার সত্যই বেদনাদায়ক। সমাজ যদি উদার হতো তাহলে হয়তো আমরা আনাকজাগোরাসের কাছ থেকে অনেক কিছু পেতে পারতাম কিন্তু সমাজ তা করেনি।

অনেক সময় সমাজ এত বেশী ধর্মান্ধ হয়েছে যে—তারা প্রচলিত চিন্তাধারাকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। কোন গণিতজ্ঞ এই প্রচলিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে মত পোষণ করলে তাকে পুড়িয়ে মারা হ'ত না হয় কারারুদ্ধ করা হ'ত। আবার অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন করা হত। ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিওকে অনেক যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়েছে।

যে সুন্দর সমাজ গঠনে আমরা এগিয়ে চলেছি সেখানে মানুষের গাণিতিক সৃজনশক্তির অবাধ স্ফূরণ হোক। মানুষের আশা এবং আনন্দের প্রদীপ সেখানে সর্বদা অনির্বান হোক। আমরা চাই নূতন সমাজ ব্যবস্থায় গণিতের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা থাক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণিত ও ধর্ম

মানুষের মনে কিভাবে গাণিতিক চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল সে কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে পর্যবেক্ষণ এর অন্যতম কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দেশে গাণিতিক চিন্তার বিকাশ ঘটে বিভিন্ন কারণে। মিশরে জমির জরিপ করার ব্যাপারে গাণিতিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল। ব্যাবিলনে গণিত চর্চার উদ্ভব হয়েছিল আকাশ পর্যবেক্ষণ তথা পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য। কিন্তু ভারতবর্ষে যাগ যজ্ঞ করার জন্য গণিতের উদ্ভব হয়। মিশরে প্রথম থেকেই পুরোহিতরা গণিতকে কব্জা করে এক রহস্যময় বিদ্যা হিসাবে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এবং এই কারণেই গণিত ও ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিপরীত এক সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বিচার করতে গেলে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই গণিত ও ধর্মকে পরস্পর বিরোধী বিষয় বলে মনে হয়। কার্যকারণ প্রকল্প যাঁর কাছে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং যিনি কার্যকারণ তত্ত্বের ক্রিয়ার বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী, তিনি কখনই এক মুহূর্তের জন্যও এ ধারণার প্রশ্রয় দিতে পারেন না যে, ঘটনাপ্রবাহ হস্তক্ষেপকারী কোন বাহ্য সত্তার অস্তিত্ব আছে।

ধর্মজগতের পাণ্ডারা চিরকাল গণিতের সঙ্গে পাঞ্জা কষেছেন এবং গণিতানুরাগীদের পীড়ন করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ অবস্থা কোন দিনই ছিল না। এখানে ধর্মের জন্য গণিতের উন্নতি ঘটেছিল। অর্থাৎ এখানে ধর্ম ও গণিতকে এমনভাবে একসূত্রে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল যে এদের প্রকৃত স্বাতন্ত্র বোঝা কঠিন। এ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে ভারতীয় জ্যামিতির কথা এবং তারপর বিভিন্ন যাগযজ্ঞে নানা প্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ধরণের সংখ্যার উল্লেখ যার বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে সমান্তর শ্রেণী, গুণোত্তর শ্রেণী ইত্যাদি গণিতের নানা বিষয় উল্লিখিত রয়েছে। প্রথমে জ্যামিতির কথাই ধরা যাক।

আমরা জানি বৈদিক যাগ যজ্ঞ করার জন্য নানা প্রকার বেদি ভারতীয়রা নির্মাণ করতেন। ফলে ভারতবর্ষে জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। বৈদিক যাগ যজ্ঞের জন্য দুধরণের অগ্নি বা বেদি নির্মাণ করা হয়। (এক) নিত্য অগ্নি

যা বাধ্যতামূলক। (দুই) কাম্য অগ্নি যা বাধ্যতামূলক নয়। হিন্দুদের বিশ্বাস এই যাগ যজ্ঞের জন্য যে সব বেদি নির্মাণ করা হয়ে থাকে তার আকার এবং আয়তন নিঁখুত না হলে যাগ যজ্ঞের জন্য যে ফল পাওয়ার কথা তা পাওয়া যায় না। এমন কি বিপরীত ফলও দেখা দিতে পারে। নিত্য অগ্নি মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত এবং এগুলি হচ্ছে (১) গার্হপত্যয় (২) আহ্বনীয় (৩) দক্ষিণাগ্নি। এগুলির প্রত্যেকটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত (ক) ইষ্টিযজ্ঞ (খ) পশুযজ্ঞ (গ) সোমযজ্ঞ।

শুল্বসূত্রগুলি পাঠ করলে দেখা যায় গার্হপত্যয় বেদি বর্গাকার। অবশ্য কখনও কখনও বৃত্তাকার বলা হয়ে থাকে। আহ্বনীয় বেদি সর্বদাই বর্গাকার এবং দক্ষিণাগ্নি অর্ধবৃত্তাকার। বলা বাহুল্য এইসব বেদির ক্ষেত্রফল সর্বদাই সমান হবে এবং এক বর্গব্যাম ধরা হয়। সুতরাং এই সমস্ত বেদি নির্মাণ করতে গোল সহজেই জ্যামিতিশাস্ত্রের কতকগুলি অংকন প্রণালী এবং কতকগুলি সূত্র জানা আবশ্যক। এই সব অংকন প্রণালীর কয়েকটি তুলে ধরছি।

(ক) একটি সরলরেখার উপর একটি বর্গক্ষেত্র অংকন।

(খ) একটি বর্গক্ষেত্রকে একটি বৃত্তে রূপান্তর এবং একটি বৃত্তকে একটি বর্গক্ষেত্রে রূপান্তর।

(গ) একটি বৃত্তের দ্বিগুণ বৃত্ত অংকন।

শেষের অংকন প্রণালী থেকে ভারতীয়রা $\sqrt{2}$-এর মান নির্ণয় করতে পারতেন। আমরা জানি সৌমিকী বেদি বা মহাবেদি একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম যার সম্মুখ 24 পদ, ভূমি 30 পদ এবং উচ্চতা 36 পদ। সৌত্রামণী বেদি মহাবেদির মত সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম। এর ক্ষেত্রফল মহাবেদির ক্ষেত্রফলের এক তৃতীয়াংশ। প্রকৃতিবেদি সৌত্রামণী বেদির এক নবমাংশ। এ থেকে আমরা যে সব জ্যামিতিক তথ্য পেতে পারি তা হচ্ছে—

(ক) প্রদত্ত বাহুগুলির সাহায্যে একটি আয়তক্ষেত্র অংকন।

(খ) কোন একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম অংকন করতে হবে যার সম্মুখ, ভূমি এবং উচ্চতা দেওয়া আছে।

(গ) একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল নির্ণয়।

(ঘ) একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়মের অংকিত করতে হবে যেটি অন্য একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফলের বিভিন্ন গুণিতক।

কাম্যঅগ্নির নির্মাণ কার্য আরও জটিল। কাম্য অগ্নির মধ্যে শ্যেনচিতি সবচেয়ে পুরানো। এই বেদির আত্মাতে (মূল অংশে) চারটি বর্গক্ষেত্র থাকবে। এবং প্রত্যেকটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এক বর্গপুরুষ, ডানাদ্বয়ের প্রত্যেকটি $1\frac{1}{5}$ বর্গপুরুষ সম্বলিত একটি আয়তক্ষেত্র হবে। এর লেজটি $1\frac{1}{10}$ বর্গপুরুষ সম্বলিত একটি আয়তক্ষেত্র হবে। অর্থাৎ এই শ্যেনচিতির ক্ষেত্রফল $7\frac{1}{2}$ বর্গপুরুষ। সেইজন্য একে সপ্তবিদ্যসারত্নি প্রাদেশ চতুরস্র শ্যেনচিতি বলা হয়। এ ছাড়া আরও নানা ধরণের বেদি আমরা দেখতে পাই। এখানে তার কতকগুলি উল্লেখ করছি।

(এক) বক্রপক্ষব্যস্ত পুচ্ছ শ্যেনচিতি, (দুই) কঙ্কচিতি, (তিন) অলজ, (চার) প্রযুগ, (পাঁচ) উভয়ত প্রযুগ (রম্বাসাকৃতি), (ছয়) রথচক্র, (সাত) দ্রোণ (আট) সমুহ্যা, (নয়) পরিচার্য (দশ) শ্মশান (এগার), কূর্ম ইত্যাদি। এগুলি নির্মাণ করতে গেলে নিম্নলিখিত জ্যামিতিক তথ্য জানা আবশ্যক।

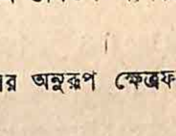
(ক) কোন বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান অথবা কোন গুণিতক আকারে কোন বর্গক্ষেত্র অংকন।

(খ) দুইটি অসমান বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের বিয়োগ ফলের অনুরূপ ক্ষেত্রফল সম্বলিত একটি বর্গক্ষেত্র অংকন।

(গ) কোন আয়তক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তর বা কোন বর্গক্ষেত্রকে আয়ত ক্ষেত্রে রূপান্তর।

(ঘ) কোন বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান করে একটি ত্রিভুজ বা রম্বস অংকন।

একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুন ক্ষেত্রফল সম্বলিত একটি বর্গক্ষেত্র অংকন করার পদ্ধতি সম্পর্কে মহর্ষি বৌধায়ন বলেছেন—"সমচতুরস্রস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুর্দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি" অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপর একগাছি রজ্জু বিস্তৃত কর। এর বর্গফল বর্গক্ষেত্রের যে কোন বাহুর বর্গফলের দ্বিগুন হবে।



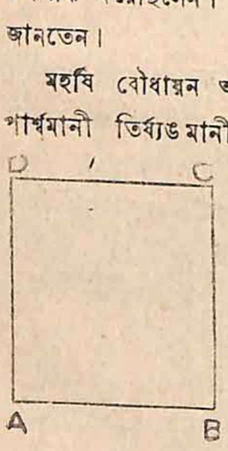
ABCD একটি বর্গক্ষেত্র। BD বর্গক্ষেত্রটির কর্ণ। BD'র উপর একটি বর্গক্ষেত্র অংকিত করলে তা ABCD বর্গক্ষেত্রটির দ্বিগুন ক্ষেত্রফল সম্বলিত একটি বর্গক্ষেত্র পাওয়া থাকে। মহর্ষি আপস্তম্ব এ সম্পর্কে বলেছেন—চতুরস্রস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুর্দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি। মহর্ষি কাত্যায়ন বলেছেন—

"সমচতুরস্রস্যায়ক্ষারজ্জুর্দ্বিকরণী" সমচতুরস্রের কর্ণের পরিমাণ যে রজ্জু তার বর্গফল সেই সমচতুরস্রের দ্বিগুন হবে। বলা বাহুল্য ভারতীয় ঋষিরা এ থেকে $\sqrt{2}$-র মান নির্ণয় করতেন। এ প্রসঙ্গে মহর্ষি বৌধায়ন বলেছেন—প্রমাণং তৃতীয়েন বর্দ্ধয়েত্তচ্চ চতুর্থেনাত্মচতুস্ত্রিংশোনেন। সবিশেষঃ। অর্থাৎ বাহুর পরিমাণের সঙ্গে তার এক তৃতীয়াংশ যোগ কর; তার সঙ্গে আবার সেই এক তৃতীয়াংশের চতুর্থভাগ যোগ কর; এর ফলে যে রাশি পাওয়া যাবে তা থেকে পূবোক্ত এক তৃতীয়াংশের চতুর্থভাগের এক চতুর্থঅংশ বিয়োগ কর। সেই বিয়োগফলই কর্ণের পরিমাণ। এই প্রক্রিয়ার ফলে যে রাশি পাওয়া যাবে তার নামই সবিশেষ। এ সম্পর্কে মহর্ষি কাত্যায়ন বলেছেন—

"করণীং তৃতীয়েন বৰ্দ্ধয়েত্তচ্চ সচতুর্থেনাত্মচতুস্ত্রিংশোনেন সবিশেষ ইতি বিশেষঃ।" এই দুই সূত্র থেকে টীকাকারগণ বলেছেন বর্গক্ষেত্রের কর্ণের পরিমাণ (যদি বাহু=এক একক ধরা হয়)

$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{3,4.34}$ এটিকে দশমিকে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় 1·4142156; বর্গক্ষেত্রের বাহুর পরিমাণ এক একক ধরার ফলে আমরা বলতে পারি $\sqrt{2}=1·4142156$; বর্তমানে $\sqrt{2}$ এর মান হোলো 1·414213......; পণ্ডিতেরা মনে করেন ভারতীয়রা বেদি নির্মাণ করতে গিয়ে $\sqrt{2}$ এর অমূলদত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এছাড়াও $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ প্রভৃতির মানও ভারতীয়রা জানতেন।

মহর্ষি বৌধায়ন আয়তক্ষেত্র সম্বন্ধে বলেছেন—"দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্য্যঙমানী চ যৎপৃথগ্‌ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি।" অর্থাৎ



আয়তক্ষেত্রের কর্ণের পরিমাণ ফল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই বাহুর পরিমাণ ফলের সমান। অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র সমকোণের পার্শ্বস্থ দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমান। ABCD একটি আযতক্ষেত্র। BD হচ্ছে এই আয়তক্ষেত্রটির কর্ণ। এর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র AB এবং AD এই দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমান হবে।

ইউক্লিডের জ্যামিতির 47-তম প্রতিজ্ঞার মূল তত্বটি মহর্ষি বৌধায়ন বলে গিয়েছেন।

তিনি বলেছেন—

ত্রিকচতুষ্কেয়ার্দ্বাদশিকপঞ্চিকয়োঃ
পঞ্চদশিকাষ্টিকয়োঃ সপ্তিকচতুর্বিংশিকয়োঃ
দ্বাদশিক পঞ্চত্রিংশিকয়োঃ পঞ্চদশিষট্
ত্রিংশকয়োরিত্যেতাস্বপলব্ধিঃ ॥

এই শ্লোকটির অনুবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে এতে বলা হয়েছে ছয়টি ত্রিভুজের প্রত্যেকটির বাহুদ্বয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 3 এবং 4, 12 এবং 5, 15 এবং 8, 7 এবং 24, 12 এবং 35, 15 এবং 36 ; সূত্রকার বলেছেন যে সব ত্রিভুজের বাহুদ্বয়ের পরিমাণ এইভাবে নির্দিষ্ট হয় তাদের কর্ণের পরিমাণ নির্ণয় করা সুসাধ্য।

সোমবেদি নির্মাণ করতে গেলে বেদির কোন পার্শ্ব কিরূপ পরিমাণ হবে এবং কিভাবেই বা বেদি অঙ্কিত করা হবে তা শুল্বসূত্রে বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহর্ষি আপস্তম্ব বলেছেন—

"ত্রিংশৎপদানি প্রক্রমা বা পশ্চাত্তিরশ্চী ভবতি ষট্ত্রিংশৎ প্রাচী
চতুর্বিংশতিঃ পুরস্তাত্তিরশ্চীতি সৌমিক্যা বেদের্বিজ্ঞায়তে।

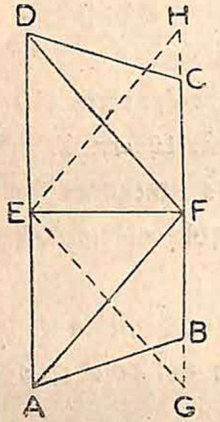
অর্থাৎ বেদির পশ্চিমপার্শ্বের পরিমাণ 30 পদ বা প্রক্রম। বেদির পূর্ব পার্শ্বের পরিমাণ 24 পদ বা প্রক্রম। বেদির প্রাচী অর্থাৎ পশ্চিম পার্শ্বের মধ্য হতে পূর্ব পার্শ্বের মধ্য পর্যন্ত বিস্তৃতির পরিমাণ 36 পদ বা প্রক্রম। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়রা এক্ষেত্রে সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছেন। এ সম্পর্কে মহর্ষি আপস্তম্ব বলেছেন।

"ষটত্রিংশিকায়া মেহষ্টাদশোপসমস্যাপরস্মাদন্তাদ্ দ্বাদশসু লক্ষণং
পঞ্চদশসু লক্ষণং পৃষ্ঠ্যান্তয়োরন্তৌ, নিয়ম্য পঞ্চদশিকেন দক্ষিণাপায়ম্য
শঙ্কুং নিহন্ত্যেবমুত্তরতস্তে শ্রোণী বিপর্য্যস্যাংসৌ পঞ্চদশিকেনৈবা
পায়ম্য দ্বাদশিক শঙ্কুং নিহন্ত্যমুত্তরস্তাবংসা তদেকরজ্জ্বা বিহরণম্"

অর্থাৎ প্রাচীর দৈর্ঘের অর্থাৎ ছত্রিশের সঙ্গে আঠার যোগ কর। পশ্চিম পার্শ্বের সীমারেখায় পনের পদ এবং পূর্ব পার্শ্বের সীমারেখায় দ্বাদশ পদ (অর্থাৎ উভয়ের মধ্য বিন্দু) চিহ্নিত কর। এরপর 54 পদ পরিমিত রজ্জু প্রাচীর দুমুখে আবদ্ধ কর। সেই রজ্জু দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে টেনে প্রাচীর মূলে সমকোণ করলে একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কিত হতে পারে। ঠিক এইভাবে রজ্জু

আকর্ষণ করলে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকেও ঐরূপ আর একটি ত্রিভুজ পাওয়া যাবে।

DEF এবং AEF দুটি ত্রিভুজ। এই দুই ত্রিভুজের EF বাহুর পরিমাণ 36, ED বা EA বাহুর পরিমাণ 15, এদের কর্ণের অর্থাৎ DF বা AF বাহুর পরিমাণ 39, আবার পূর্বোক্ত রজ্জুকে যদি FB বা FC রেখার সঙ্গে সমসূত্রে রেখে দুই পার্শে দুটি ত্রিভুজ অঙ্কিত করা যায় তাহলে EFH এবং EFG দুটি ত্রিভুজ অঙ্কিত হবে। আর এই দুই ত্রিভুজের কর্ণের ও বাহুদ্বয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 39, 36 এবং 15 হবে। এইভাবে বেদির পরিমাণ ফল পাওয়া যাবে।



আমরা জানি মহাবেদি একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম যার সম্মুখভাগ 24 প্রক্রম, ভূমি 30 প্রক্রম উচ্চতা 36 প্রক্রম। সৌত্রামণী বেদি এই বেদির এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ উচ্চতা $12\sqrt{3}$, ভূমি $10\sqrt{3}$, সম্মুখ $8\sqrt{3}$; সুতরাং সৌত্রামণী বেদির ক্ষেত্রফল $=12\sqrt{3}\times\frac{1}{2}(8\sqrt{3}+10\sqrt{3})=324$ বর্গপুরুষ,

এটি মহাবেদির এক তৃতীয়াংশ। আমরা দেখেছি বিভিন্ন আকারের সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম করতে গেলে নিম্নোক্ত বীজগাণিতিক সমীকরণ পাওয়া যায়

$$36x\left(\frac{24x+30x}{2}\right)=36\times\left(\frac{24+30}{2}\right)+m$$

এখানে $m=$ ক্ষেত্রফলের সামগ্রিক বৃদ্ধি

$\therefore\ 972x^2=972+m$

এই সূত্রটি শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।

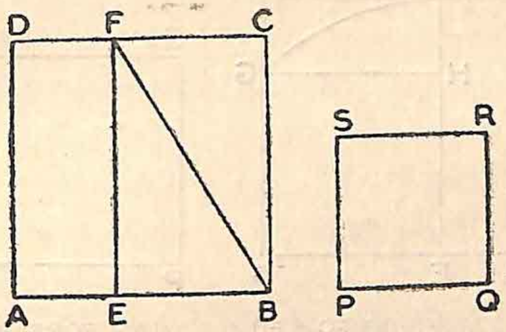
সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ভারতীয়রা $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ প্রভৃতির মান নির্ণয় করতে পারতেন।

দুটি ভিন্ন আকারের বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি একটি নূতন বর্গক্ষেত্র অঙ্কন। এ সম্পর্কে মহর্ষি কাত্যায়ন বলেছেন—

"সমচতুরস্রাণামুক্তঃ সমাসো নানা প্রমাণসমাসে হ্রসীয়সঃ করণ্যা বর্ষীয়সোহপচ্ছিন্দ্যাত্তস্যাক্ষয়ারজ্জুরুভে সমস্যতীতি সমাসঃ

অর্থাৎ বিভিন্ন আকারের দুটি বর্গক্ষেত্রের পরিমাণে একটি বর্গক্ষেত্র আঁকতে গেলে উভয় বর্গক্ষেত্রের দুটি বাহু নিয়ে একটি সমকোণী আয়তক্ষেত্র অঙ্কন কর। সেই আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের পরিমাণফল পূর্বোক্ত দুটি বর্গক্ষেত্রের পরিমাণ ফলের সমান হবে।

ABCD এবং PQRS দুটি অসমান বর্গক্ষেত্র। এই দুটি বর্গক্ষেত্রের পরিমাণ ফলের সমান একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করার প্রয়োজন। ABCD বর্গক্ষেত্রের AB



বাহু:থেকে PQ'র সমান করে EB অংশ কাটা হোলো। তারপর EB এবং BC বাহুদ্বয় নিয়ে EBCF একটি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করা হোলো। তারপর BF এর উপর একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করলেই ABCD এবং PQRS বর্গক্ষেত্রের সমান একটি বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন হবে।

একটি বর্গক্ষেত্র হতে অন্য একটি বর্গক্ষেত্র বিয়োগ করে নূতন বর্গক্ষেত্র রচনা। এ সম্পর্কে মহর্ষি বৌধায়ন বলেছেন—

"চতুরাস্রাচ্চতুরস্রং নির্জিহীর্ষন্যাবন্নির্জিহীর্ষেত্তস্য করণ্যা

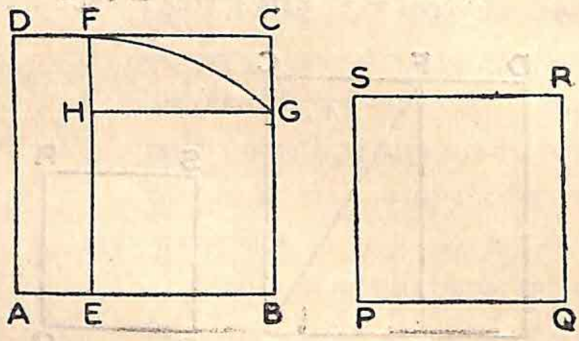
বর্ষীয়সো বৃধ্রমুল্লিখেদ্‌বৃধ্রস্য পার্শ্বমানীমক্ষয়েতরৎ

পার্শ্বমুপসংহরেৎসা যত্র নিপতেত্তদপচ্ছিন্দ্যাছিন্নয়া নিরস্তম্।

অর্থাৎ যদি বৃহত্তর বর্গক্ষেত্র থেকে অপর একটি ক্ষুদ্রতর বর্গক্ষেত্রের সমানাংশ বিয়োগ করার প্রয়োজন হয় তাহলে বৃহত্তর বর্গক্ষেত্রের একটি বাহু থেকে ক্ষুদ্রতর বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর সমান করে একটি অংশ কেটে নাও। পরে সেই অংশে ও বৃহত্তর বর্গক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ বাহুতে একটি সমকোণী আয়তক্ষেত্র অঙ্কিত করো। তারপর সেই সমকোণী আয়তক্ষেত্রের একটি বাহুকে বিপরীত দিকে বৃহত্তর বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর সঙ্গে মিলিয়ে দাও। সেই মিলন বিন্দু

হতে ক্ষুদ্রতর অংশ কেটে নাও। এরদ্বারা অভিপ্সিত বিয়োগ ক্রিয়া সাধিত হবে।

ABCD এবং PQRS দুটি ভিন্ন বর্গক্ষেত্র। এখানে ABCD বর্গক্ষেত্রটি বৃহৎ এবং PQRS বর্গক্ষেত্রটি ক্ষুদ্র। এখন ABCD থেকে PQRS বর্গক্ষেত্রটি বিয়োগ করতে হবে। ABCD বর্গক্ষেত্র থেকে BCFE আয়তক্ষেত্রটি এরূপভাবে কেটে



নাও যাতে ঐ আয়তক্ষেত্রের FC ও EB বাহু যথাক্রমে PQRS বর্গক্ষেত্রের SR এবং PQ বাহুদ্বয়ের সমান হয়। EF বাহুর পরিমাণ একগাছি রজ্জু নিয়ে E' কে কেন্দ্র করে একটি বৃত্তচাপ অঙ্কিত করা হোলো। মনে করা যাক এই বৃত্তচাপ BC বাহুর G বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখন BG উপর অঙ্কিত EBGH বর্গক্ষেত্রটি দ্বারা বিয়োগফল বিজ্ঞাপিত হবে।

এই সামান্য কয়েকটি উদাহরণ থেকে আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষে গণিত ও ধর্মের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশে গণিত ও ধর্মের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটানোর কথা কেউ চিন্তাই করে নি। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করতেন গাণিতিক জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে এমন বিরোধ বিদ্যমান যার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এঁদের মধ্যে অনেকেই চিন্তা করতেন যে এবার ক্রমবর্ধিত হারে গাণিতিক জ্ঞানকে বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। এঁদের মতে (গাণিতিক) জ্ঞানের আধার বিহীন বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র এবং সেই হেতু এর বিরোধিতা করতে হবে। একথা সত্য যে অভিজ্ঞতা ও স্পষ্টচিন্তাই গণিত এবং বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তবে বহু গণিতবিদের দুর্বল অংশ হচ্ছে—আচরণ এবং বিচারবুদ্ধির মুখ্য নিয়ামক বিশ্বাসসমূহকে কেবল নিরেট গাণিতিক

পদ্ধতিতে পেতে চেষ্টা করেন। গাণিতিক পদ্ধতি গাণিতিক চিন্তাসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও তারা একে অপরের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে সেটাই মুখ্য বিষয়। গাণিতিক চিন্তা কথাটা বিষয়মুখী অথবা ধর্মমুখী তা বলা কঠিন। তবে কিছু গাণিতিক চিন্তা বিষয়মুখী বা ধর্মমুখী। এই নিছক বিষয়মুখী বা ধর্মমুখী সত্যের জ্ঞান চমৎকার কিন্তু জীবনে পথ নির্দেশ দানের ব্যাপারে ক্ষমতা সীমিত। কারণ ঐ বিষয়মুখী বা ধর্মমুখী গাণিতিক জ্ঞান আশা আকাজ্ক্ষার মূল্য বা সার্থকতা প্রমাণ করতে বহুক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে অধিকাংশ ভারতীয়দের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি ধর্মীয়ভাব ছিল তবে এটা প্রাকৃতজনের ধর্ম থেকে পৃথক। সাধারণ লোকের কাছে ঈশ্বর এমন একটি সত্তা যাঁর কৃপাদৃষ্টিতে উপকার হয় এবং যাঁর রোষে আতঙ্কের ব্যাপার ঘটে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে কাজ করে বিশ্বজনীন কারণত্ব। ভবিষ্যতের সবটুকুই তাঁদের নিকট অতীতের মতই প্রয়োজনীয় ও পূর্ব নির্ধারিত। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সুসংবদ্ধতাদৃষ্টে উদ্ভূত এক বোধাতীত বিপুল বিস্ময়তাই হচ্ছে তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতি। গাণিতিক নিয়মাবলীর মধ্যে তাঁরা এক উঁচু ধরণের সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পান যার তুলনায় মানুষের যাবতীয় বিধিবদ্ধ চিন্তা ও কর্ম একান্ত তুচ্ছ মনে হয়। বলা বাহুল্য এঁদের নিকট গণিত হচ্ছে ধর্মের বন্ধু। এটি ভাবাবেগ বা প্রবল ইচ্ছাকে বিমোহিত করে, কল্পনার প্রচণ্ডতাকে দমন করে, ভ্রান্তি ও পূর্বসংস্কার, দ্বিধা ও অসত্য যুক্তি ইত্যাদি থেকে মনকে নির্মল করে। অনেক সময় গাণিতিক চিন্তা পাপ পথ থেকে মানুষকে প্রকৃত যুক্তির দিকে নিয়ে যায় এবং পরম আনন্দ দেয়। হয়তো ভারতীয়দের কাছে গণিতই শ্রেষ্ঠ জীবন এবং ঈশ্বরের জীবন হচ্ছে গণিত। ঈশ্বর প্রেরিত সকল দূতই হচ্ছেন গণিতবিদ। এবং এইহেতু গণিত হচ্ছে ধর্ম। ভারতীয়দের নিকট গণিতচর্চার লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব প্রকৃতির গূঢ় রহস্য অনুসন্ধান করা। এঁদের নিকট গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির মানানসই ও সুন্দর সম্পর্ক জ্ঞান লাভ করাই গাণিতিক সত্য হিসাবে পরিগণিত হয়। এঁরা হয়তো চিন্তা করেন যদি ভাষা ঈশ্বরের স্বরকে অনুকরণ করে তাঁর হৃদয়কে ব্যক্ত করে তাহলে গণিত তাঁর প্রজ্ঞাকে উন্মুক্ত করে থাকে। গাণিতিক চিন্তা তাঁদের শক্তি দেয় এবং সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত করে।

হয়তো ভারতীয়রা গণিত ও ধর্মকে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে

সমগোত্রীয় ভাবতেন। কারণ যাঁরা গণিত চর্চা করেন এবং যাঁরা ধার্মিক তাঁরা প্রত্যেকে নিজেকে যথাসাধ্য আত্মকেন্দ্রিক কামনা বাসনার বন্ধনজাল থেকে বিমুক্ত করে সর্বক্ষণ স্বার্থশূন্য চিন্তা বাসনা এবং আশা আকাঙ্খা নিয়ে মগ্ন থাকেন। এঁদের মনে এই সব মানবিক গুণের প্রতি তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এঁদের নিজেদের অস্তিত্বের মত এগুলির অস্তিত্ব বাস্তব এবং স্বতঃ প্রমাণিত। এই অর্থে গণিত ও ধর্ম হচ্ছে এই সব মূল্যবোধ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়ে প্রতিনিয়ত এর পরিণামকে শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপক করার কাজে নিয়োজিত। হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ভারতীয়রা গণিত ও ধর্মের মধ্যে কোনমতেই দ্বন্দ্বের অবকাশ দেখতে পেতেন না। গণিত শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে কি হওয়া উচিত তাও নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই পরিধির বাইরেও সর্ববিধ প্রকারের মূল্য বিচারের অবকাশ রয়েছে। অন্যদিকে ধর্ম শুধু মানুষের চিন্তা ও কার্যের মূল্যায়ণ করে। প্রকৃত তথ্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে কথা বলার ন্যায় সঙ্গত অধিকার নেই। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বাইবেলে যা কিছু লিখিত আছে তার সম্পূর্ণ অভ্রান্ততা মেনে নেবার জন্য যখন কোন ধর্ম সম্প্রদায় পীড়াপীড়ি করেন তখন এক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হচ্ছে গণিতের ক্ষেত্রে ধর্মের অহেতুক হস্তক্ষেপ। এই পটভূমিকায় ধর্মগুরুরা কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও প্রমুখদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ব্যাপাটি একটু পরিষ্কার করেই বলি। নিকোলাস কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রিক আমাদের এই সৌরজগতের কথা বলেছিলেন। যদিও তাঁর ভাষায় বলতে গেলে এই পরিকল্পনার জনক তিনি নন। তাঁর পূর্বসূরীরা এ ব্যাপার চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। তিনি এই মতকে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন মাত্র। বলা বাহুল্য এই সূর্যকেন্দ্রিক কথা খ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের মনঃপুত হোলো না। প্রচণ্ড অসন্তোষ, তীব্র সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তাঁর মতকে তিনি বই-এর আকারে প্রকাশ করলেন না। বলা বাহুল্য ধর্মের এই অহেতুক হস্তক্ষেপ সত্যিই বেদনাদায়ক। যাই হোক তাঁর বন্ধুদের সহায়তায় বইটি প্রকাশ পায় কিন্তু অনেক কাট ছাঁট করার পর। কারণ তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে বইটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ইনি লুথারপন্থী ছিলেন।

কোপার্নিকাসের মত প্রকাশ করলে লুথারপন্থীরা ক্ষিপ্ত হবেন জেনে সেই বন্ধুটি বইটির কিছু পরিবর্তন করে প্রকাশ করেন। কোপার্নিকাস কিন্তু অনুরোধ করে বন্ধুকে বলেছিলেন—'আমি বরাবরই এরূপ অনুভব করেছি যে আপনার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগুলি ঠিক বিশ্বাসের বস্তু নয়, গণনার ভিত্তিস্বরূপ মাত্র। সুতরাং ইহাদের দ্বারা যখন তথ্যগুলি যথাযথ বুঝানো যাইতেছে মিথ্যা হইলেও ইহাতে (এরূপ সিদ্ধান্তে) কিছু আসিয়া যায় না। ... ... সুতরাং ভূমিকায় এ সম্বন্ধে থাকা উচিত।" বলা বাহুল্য কোপার্নিকাসের এই মত তিনি মেনে নেন নি। এবং ঐ বন্ধুটি গ্রন্থটির নাম করেন orbium coelestium. যার অর্থ স্বর্গীয় গোলক। এই ধরণের নামকরণের জন্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে সমগ্র গ্রন্থটি টলেমীর ছাঁচে ঢালা। কি আশ্চর্য! ধর্ম যে এভাবে গণিতের উপর প্রভাব বিস্তার করবে তা বর্তমানে চিন্তা করলে অবাক লাগে। ব্রুণোর বৈপ্লবিক মতবাদ ও তার জন্য বাড়াবাড়ির পর থেকে সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের লিখন পঠন ও প্রকাশ ধর্মসংস্থা থেকে নিষিদ্ধ হয়। ফলে De revolutionibus নিষিদ্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। হয়তো এই সমস্ত মতবাদের জন্য খ্রীষ্টধর্ম বিপন্ন বোধ করেছিল বলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ধর্মের কারণে আর একজন গণিতবিদ গ্যালিলিও নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। তাঁর ঘটনাটি তুলে না ধরলে ধর্ম ও গণিত সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় মতবাদের প্রতি গ্যালিলিওর আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। তবুও 'সূর্যকেন্দ্রিক পরিকল্পনা' এই মতধারার সঙ্গে গ্যালিলিও যে একমত ছিলেন সে কথা ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে টলেমীপন্থীরা ও ধর্মসংস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। 1613 খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিওর সৌর কলঙ্কের পত্রাবলী প্রকাশিত হোলো এবং এই প্রবন্ধে কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রতিফলিত হয়। ফলে ধর্মীয় সংস্থা এ সুযোগ ছাড়লেন না। এবং এ ব্যাপারে পঞ্চম পলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্চমপল সরকারীভাবে গ্যালিলিওকে তাঁর মতবাদ ও আবিষ্কারকে ব্যাখ্যা করতে রোমে ডেকে পাঠালেন। রোমে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর আবিষ্কারকে ব্যাখ্যা করলেন এবং দূরবীন দিয়ে তাঁর মতবাদের যথার্থতা প্রমাণ করলেন। বিরোধীরা পরাজিত হোলো। তাঁর এই সাফল্যে তিনি আরও উৎসাহিত হলেন। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে

বাইবেলের নানা উক্তির সঙ্গে সূর্যকেন্দ্রীক মতবাদের আপাত অসঙ্গতি শুধু ব্যাখ্যা করাই সম্ভব নয়, সমগ্রভাবে দেখতে গেলে বাইবেল এই মতবাদের সমর্থক। বলা বাহুল্য এতে ধর্মীয় সংস্থা গেল ক্ষেপে। ফলে গ্যালিলিওকে সতর্ক করে দেওয়া হোলো এবং বলা হোলো যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যাখ্যার জন্য পবিত্র ধর্মতত্ত্বমূলক যুক্তির অবতারণা যেন না করা হয়। এর এক বছর পরে রোমের ধর্মসংস্থা পৃথিবীর গতিবাদ সম্পর্কে সমস্ত রকমের আলোচনা, রচনা ও পঠন পাঠন নিষিদ্ধ করলেন। তাছাড়া গ্যালিলিওকে বলা হোলো কোপার্নিকাসের মতবাদ শিক্ষা দেবার থেকে তিনি যেন বিরত থাকেন। ধর্মের এহেন বাড়াবাড়িতে গাণিতিক চিন্তা সেদিন হয়েছিল ব্যাহত। ধর্মের সঙ্গে গণিতের সমন্বয় না করে এখানে বিরোধ জাগিয়ে তোলা হয়েছিল। গ্যালিলিও এরপর কিছুকাল নীরবতা অবলম্বন করেছিল। তারপর কার্ডিন্যাল বার্বেরিণো অষ্টম উর্বাণ নাম নিয়ে পোপের পদে অভিষিক্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি সদ্য প্রকাশিত II Saggiatore বইটি পোপের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন এবং এতে কোপার্নিকাসের মতবাদই প্রতিফলিত হয়। বলা বাহুল্য পোপের উদ্দেশ্যে এইটি উৎসর্গ করার জন্য এ নিয়ে বিশেষ উচ্চ বাচ্চ হলো না। এরপর 1632 খ্রীষ্টাব্দে 'Dialogue Concerning the two Chief system of the world, the Ptolemic and Copernican" গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশ পাবার পরই ধর্মসংস্থার কর্তৃপক্ষরা বিরোধী হয়ে ওঠেন। এবং শেষে তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। এই বিচারে গ্যালিলিও সম্পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বয়স হয়েছে, যদি তিনি আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে হয়তো ব্রুণোর দশা হতে পারে। তিনি মার্জনা ভিক্ষা করে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে সাক্ষর করলেন। এই পত্রটি বিভিন্ন গির্জায় টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। এই পত্রটির অনুবাদ এখানে দেওয়া তুলে ধরা হোলো।

"আমি ফ্লোরেন্স নিবাসী স্বর্গীয় ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলিওর পুত্র, সত্তর বৎসর বয়স্ক গ্যালিলিও গ্যালিলি সশরীরে বিচারার্থ আনীত হইয়া এবং অতি প্রখ্যাত ও সম্মানার্হ ধর্মযাজগণের ও নিখিল খ্রীষ্টীয় সাধারণতন্ত্রে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণজনিত অপরাধের সাধারণ বিচারপতিগণের সম্মুখে নতজানু হইয়া স্বহস্তে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ স্পর্শপূর্বক শপথ করিতেছি যে রোমের পবিত্র ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম সংস্থার দ্বারা

যাহা কিছু শিক্ষাদান ও প্রচার করা হইয়াছে ও যাহা কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে আমি তাহা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছি, এখনও করি এবং ঈশ্বরের সহায়তায় ভবিষ্যতে করিব। সূর্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং নিশ্চল এইরূপ মিথ্যা অভিমত যে কিরূপ শাস্ত্র বিরোধী সে সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করা হইয়াছিল ; এই মিথ্যা অভিমত পরিহার করিয়া ইহার সমর্থন ও শিক্ষকতা হইতে সর্বপ্রকার নিবৃত্ত থাকিতে আমি এই পবিত্র ধর্মসংস্থা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলাম। ... ...

... ...

... ... । ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ স্বহস্ত লিখিত শপথলিপি যাহার প্রতিটি অক্ষর এইমাত্র আপনাদের পাঠ করিয়া শুনাইলাম তাহা আপনাদের নিকট সমর্পণ করিতেছি। 22শে জুন 1633 খ্রীষ্টাব্দ, রোমের মিনার্ভা কনভেন্ট। (দ্রষ্টব্য—বিজ্ঞানের ইতিহাস, ২য়, সমরেন্দ্রনাথ সেন)

এ থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে ধর্মীয় সংস্থার অনাবশ্যক হস্তক্ষেপে গাণিতিক চিন্তা মুক্ত চিন্তায় পর্যবসিত হতে পারে নি। অন্যদিকে আবার গণিতের প্রতিনিধিরাও ধর্মের মধ্যে গণিতের পদ্ধতির ভিত্তিতে সময় সময় মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে মৌলিক বিচার করার চেষ্টা করেন এবং এইভাবে নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছেন। এই ধরণের মারাত্মক ভ্রান্তি থেকেই সংঘর্ষের উদ্ভব হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে আমরা বলে থাকি ধর্ম ও গণিতের বিচারক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই দুইএর মধ্যে গভীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। ধর্ম হয়তো মানবজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে কিন্তু তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য বহুক্ষেত্রে গণিতের সাহায্য নিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুদের যাগযজ্ঞের কথা ধরা যেতে পারে। এখানে বেদি নির্মাণকার্যে গণিতের সাহায্য নিতে হয়েছে গাণিতিক চিন্তা শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা সত্য ও ধীলাভের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। অবশ্য অনুভূতির এই উৎসের গোমুখ রয়েছে ধর্মের এলাকায়। এর সঙ্গে আছে যুক্তির দ্বারা বোধগম্যতা। মনে হয় এ ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত না থাকলে কেউ প্রকৃত গণিতবিদ হতে পারে না। একথা ঠিক ধর্মছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু আবার বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ। এখানে ধর্ম বলতে ঈশ্বরের সাধনায় রত কার্যকেই বলা হচ্ছে না। এটি হচ্ছে বিভিন্ন

কাজের গুণাবলী। ধর্ম এবং গাণতের পরিধি সংক্রান্ত বিরোধের মূল উৎস হচ্ছে মানুষের ঈশ্বরের কল্পনা। গণিত তথা বিজ্ঞান ধর্মকে ঈশ্বরের নরাকৃতিবাদরূপী খাদ থেকে মুক্ত করে এবং গণিত আমাদের জীবনবোধের এক ধর্মীয় অধ্যাত্মীকরণও করে থাকে। বলা বাহুল্য গাণিতিক চিন্তার উপলব্ধির পথে ধর্মীয় পর্যায় থেকে বিমূর্ত গাণিতিক চিন্তায় আকস্মিকভাবে উপনীত হয় নি। এই দুটি ধারা এমন পরস্পর বিরোধী যে এদের অন্তবর্তীকালীন অবস্থার জন্য একটি মাধ্যমিক গাণিতিক ধারণার আবশ্যকীয়তা ছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ধর্ম এবং গণিতের মধ্যে সত্য সত্যই কি কোন অনতিক্রমনীয় বিরোধ বিদ্যমান আছে? গণিত তথা বিজ্ঞান কি ধর্মকে মর্যাদাচ্যুত করে সেই স্থানে অধিস্থিত হবে? একথা ঠিক যে প্রত্যক্ষভাব গণিত জ্ঞানের জনক এবং পরোক্ষভাবে কর্ম পদ্ধতির সহায়ক। লক্ষ্য নির্ধারণ এবং মূল্যবোধ নির্ণয় করা গণিতের ক্ষেত্র বহির্ভূত ব্যাপার। হয়তো গণিত তার কারণিক সম্বন্ধের ধারণাশক্তি অনুযায়ী কোন বিশেষ আদর্শ বা মূল্য-বোধের সুসংগতি বা বৈশাদৃশ্য সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেও লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ সম্বন্ধে স্বাধীন ও মৌলিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা গণিতের আয়ত্বের বাইরে থেকে যায়।

পক্ষান্তরে ধর্ম সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ নিয়েই এর কাজ। মানুষের চিন্তা ও কর্মের হৃদয়াবেগ সজ্ঞাত আধারের উপরই মোটামুটি এর অবস্থিতি। তবে মানব প্রজাতির প্রায় অপরিবর্তনীয় বংশগত সংস্কার ধর্মকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি মানুষের মনোভাব, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের আদর্শ নির্ধারণ এবং মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই ধর্মের বিচরণভূমি। মানব জীবনে মহাকাব্যের কতকগুলি ভাবধারার প্রভাব বেশী। ফলে মানব জীবনের মূল্যায়ণ, ক্রিয়া এবং কার্যকলাপ প্রভাবিত হতে দেখা যায়। ধর্মীয় ঐতিহ্যের এই পৌরাণিক অথবা বলা যেতে পারে সাংকেতিক অন্তর্গূঢ় বস্তুর সঙ্গেই গণিতের সংঘর্ষ হবার সম্ভবনা বেশী। এ ধরণের সংঘর্ষ তখন ঘটে যখন ধর্মীয় কল্পনা গণিতের এলাকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে গোঁড়ামীপূর্ণ উক্তি করে। যেমন আমাদের সৌরকেন্দ্রীক পরিবারের ব্যাপারে অহেতুক খ্রীষ্টান যাজকদের গোঁড়ামীপূর্ণ মন্তব্য এবং প্রভাব বিস্তারের কথা ধরা যেতে পারে। এ কথা ঠিক যে গাণিতিক গবেষণার ফলসমূহ ধর্ম

বা নীতিশাস্ত্রের বিচার বিবেচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে যে সব ব্যক্তি গণিতে সৃজনশীল অবদান রেখে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই ধর্মীয় বিশ্বাসে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

রেনে দেকার্ত যুক্তিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। গোঁড়া খ্রীষ্টানরা ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু গণিতবিদ ও বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বরের শক্তির সীমিত সামর্থের কথা বলে থাকেন। দেকার্ত বলেছিলেন—গতি, বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বরের হাত নেই।

ইউরোপের নবজাগরণের সময় অনেক গণিতবিদই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁরা প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে বেশী মাথা ঘামাতেন আবার ভাবতেন "প্রকৃতিই হচ্ছে ঈশ্বরের কর্ম"। প্রকৃতির চর্চা করার অর্থই হচ্ছে ভগবৎ চর্চা করা ; প্রকৃতি হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং যুক্তির দ্বারা বিচার বিবেচনা হচ্ছে ঈশ্বরের জ্ঞানকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা। নিউটনের শিক্ষক আইজ্যাক ব্যারো গণিতের সঙ্গে ধর্মের একটি সম্বন্ধ নির্ণয় করেছিলেন। তিনি বলতেন ভাল ধর্মতত্ত্ববিদ হতে গেলে ক্রমপঞ্জী (chronology) জানা প্রয়োজন। ক্রমপঞ্জী জানতে গেলে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানতে হবে এবং এই জন্যই গণিত চর্চার প্রয়োজন। আইজ্যাক ব্যারো ঠিক এই জন্যই গণিত চর্চা করতেন। নিউটনের মধ্যে ধর্মের প্রভাব বেশ দেখা যায়। তিনি ভাবতেন বিজ্ঞান ও গণিত চর্চা করা প্রয়োজন যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বকে গড়েছেন। নিউটন সর্বদাই বিশ্বগঠনে এবং তার রূপরেখায় ঈশ্বরের হাত আছে বলে ভাবতেন। তাঁর চিন্তাধারায় ঈশ্বর সম্বন্ধে এত ব্যাপকত্ব ছিল যে তিনি তাবতেন ঈশ্বর-ই গণিত।'

আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বলা যায় ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার পিছনে গণিত ও পদার্থবিদ্যার চর্চা করা অন্যতম কারণ। ঈশ্বরের জন্যই প্রকৃতি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গণিতের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত গণিতবিদ লিওনার্দ অয়লার বলতেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব গাণিতিক সূত্রের সাহায্য প্রমাণ করা সম্ভব। ঈশ্বর এবং তাঁর ভূমিকার উপর বহু গণিতজ্ঞের শ্রদ্ধা থাকলেও একদল গণিতজ্ঞ সর্বদা ভাবতেন সবকিছুর উপর ঈশ্বরের প্রভাব নেই। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ পাস্কাল ভাবতেন প্রকৃতির চর্চা করার অর্থই হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের চর্চা বোঝায় না। তিনি বলেছেন প্রকৃতিই প্রমাণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁদের

কাছে যাঁরা এ বিষয়ে বিশ্বাসী। ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। তাঁকে যুক্তির দ্বারা বিচার করা যায় না! যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা এই বিশ্বাসে মনপ্রাণ সঁপে দেন। কিন্তু গণিত হচ্ছে একাগ্রতার সাহায্যে পরম সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া যা তাৎক্ষণিক লাভ ও ক্ষতির উর্ধে। আমাদের সীমিত শক্তির সাহায্যে গণিত পরম ও অসীমত্বের দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়। এবং দেখা যায় অন্যান্য শাখা সাগ্রহে এর দিকে অগ্রসর হোলেও প্রায়শঃ ব্যর্থ হয়। আমাদের মধ্যে যে পরম সত্য লুকিয়ে আছে তার অনুশীলন করাও গণিতের বিষয়। বলা বাহুল্য এটি শুধু আদির্বিদ্যক অবস্থায় অবস্থান করে না। পরম কার্যকারণ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করে। প্রকৃতির সমস্ত কিছু থেকে জীবনের সর্বপ্রকার কার্যকারণের প্রতিমূর্তির মধ্যে সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার শক্তি ও জ্ঞানের নিয়ন্ত্রনাধীন হতে হবে। যার ফলে প্রাচীন ঋষিরা বলতেন ঈশ্বর জ্যামিতিবিদ। অনেক গণিতিবিদ আছেন যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী কিন্তু গণিতকে তাঁরা ঈশ্বরের সন্ধানে নিয়োজিত করেননি। অবশ্য প্রখ্যাত গণিতবিদ লাইবনিজ বলেছেন— "এমন অনেক জিনিস আছে যা বিজ্ঞানের থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের দ্বারা আরও সুচারু ভাবে ব্যাখা করা যায়"। বলা বাহুল্য এখানে বিজ্ঞান বলতে গণিতের কথাই বলা হয়েছে। অনেকে নিউটনের আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে বলে থাকেন যে এই সমস্ত আবিষ্কার স্রষ্টার জ্ঞান ও অস্তিত্বকেই প্রমাণ করছে। বিশপ বার্কলে তো সরাররি গণিতকে আক্রমণ করে বলেছেন যে গণিত হচ্ছে ধর্মকে আক্রমণ করার একটি যন্ত্রবিশেষ। ধর্মকে আঘাত হানতেই গণিতের বিকাশ ঘটছে। কি আশ্চর্যই বিশপ বার্কলের মত পণ্ডিতের এ উক্তি আমাদের মনকে নাড়া দেয়। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না তিনি এভাবে গণিত ও ধর্মকে বিরোধের মধ্যে সরাসরি টেনে আনলেন কেন? প্রাচীন ভারতে তো গণিত ও ধর্মকে কি সুন্দর ভাবে সমন্বয় ঘটান হয়েছিল। এবং এরই ফলে সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে উঠেছিল।

যুক্তির যুগে (age of reason) ধর্মকে নূতনভাবে ঢেলে সাজানোর ফলে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর নূতন চিন্তাভাবনার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোতে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রকৃতিতে গণিতের প্রভাব রয়েছে এবং এরই সাহায্যে ধর্মকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হতে থাকে। দার্শনিক লক প্রশ্ন তুলে ছিলেন এমন কি স্বতঃসিদ্ধ আমরা গ্রহণ করব যা ধর্মীয় সত্যের ভিত্তি হবে?

তিনি অবশ্য ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলতেন যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত পরিকল্পনা করেছেন। এবং তাঁর ইচ্ছামত সৃষ্টি করছেন সেই হেতু মানুষ ঈশ্বরকে মান্য করে। একথা সত্য যে তখনকার দিনের লোকের ধারণা ছিল যে ঈশ্বর সূর্যের গতি স্তব্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসার্ধের অনুপাতকে পরিবর্তন করতে পারেন না। ঈশ্বরবাদীরা প্রকৃতি থেকে মতবাদ গ্রহন করেন। তাঁরা বৃক্ষ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণের ব্যাপার নিয়ে ততটা উৎসুক নয়। তাঁরা প্রকৃতি যে গাণিতিক নিয়মে বাঁধা তাতেই উৎসাহ বোধ করতেন।

সপ্তম অধ্যায়

গণিত ও সাহিত্য

চিন্তাজগতে গণিত ও সাহিত্য দুই মেরুতে অবস্থিত একথা আবহমান কাল থেকে শোনা যায়। অর্থাৎ চিন্তার জগতে এই দুই শাখা বিপরীতমুখী। গণিতজ্ঞরা সেই সমস্ত জিনিস নিয়ে চিন্তা করেন যা পরিষ্কার এবং স্বতন্ত্র ধারণায় মণ্ডিত। এগুলিকে তাঁরা সঠিক এবং অপরিবর্তনীয় নামে নামকরণ করে থাকেন। এবং মুখবন্ধস্বরূপ কিছু স্বীকার্য চিন্তা করেন যা পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় গাণিতিক সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। এ থেকে যে সব গাণিতক তত্ত্ব পাওয়া যায় তা প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করেন। বলা বাহুল্য, এরপর চেষ্টা করা হয় এটির বিস্তৃতিকরণে এবং সরলীকরণে যাতে মোটামুটি যাঁদের গাণিতিক চিন্তাধারা পরিপক্ক তাঁদের বোধগম্যতার মধ্যে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেক সন্দেহজনক ও অজানা চিন্তাকে মননের সাহায্যে গণিতবিদরা বিচার বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু গণিতবিদরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন তাঁরা সব কিছু জানতে চান না বা তাঁরা সব বিষয়ে নাক গলাতে চান না। তবে যেটুকু জানেন তা খাঁটি এবং যা কিছু প্রকাশ করেন তা অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যবিষয়ে তাঁরা নীরব শ্রোতা বা দর্শকমাত্র এবং তাঁরা অনাবশ্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দেবার নীতির বিরোধী। তাঁদের চিন্তা-যা সম্পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে না তা তাঁরা প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ ভাসাভাসা ধারণা বা ভাবাবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন না। কয়েকটি অভ্রান্ত সূত্রের বা নীতির উপর ভিত্তি করেই গণিতজ্ঞরা তাঁদের যুক্তির জাল বিস্তার করেন। এঁরা প্রতিটি শব্দ এমনভাবে চয়ন করেন যে, প্রত্যেকটি শব্দ নূতন ধারণার সৃষ্টি করে। এমন সুন্দর ও সঠিক সংজ্ঞা তাঁরা দেন যে পাঠক ও গণিতজ্ঞরা এ ব্যাপারে একাত্ম বোধ করেন। যখন তাঁরা কোন পদকে (term) সংজ্ঞায়িত করেন তখন এটির প্রয়োগেও সচেষ্ট হন। হয়তো মুখবন্ধস্বরূপ তাঁরা কোন স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেন।

লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাবো গণিতবিদদের মধ্যে গণিতজ্ঞোচিত সংবেদ সুলভ, কিন্তু গাণিতিক চিন্তাধর্মী অন্তর্ভবনার বহিঃ প্রকাশের সামর্থ্য খুব কম জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। আমরা সকলেই রামানুজনের মতো

গাণিতিক চিন্তাকে মনের গহন তল থেকে শুরু করে থাকি কিন্তু তাঁর মতো করে যুক্তিতর্ক ও প্রথানুযায়ী সিদ্ধান্তে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নেই। এক্ষেত্রে উপমার সাহায্য নিলে বলতে হয় আমরা অনেকেই শেলীর মতো বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো অনুভব করি কিন্তু সেই অনুভূতিকে এঁদের মতো করে কবিতার সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি না।

অপরপক্ষে সাহিত্য শিল্পীর লক্ষ্য সমগ্র মানবিক অস্তিত্বের বহু ব্যঞ্জনার প্রকাশ এবং এক্ষেত্রে ভাষা একটি প্রধান প্রতীক। যেমন একটি কথাকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করে তাকে পরিচিত কোন বাক্যের অংশবিশেষরূপে না ভেবে তাকে তার স্বপ্রকৃতিতে শব্দ ও অর্থের একটি স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করা যায় তখন এই মানসিক রূপরেখা যে শব্দ সেইসব শব্দকে আশ্রয় করে আগামীকালের সাহিত্যের বা কবিতার বিশ্বজনীন ভাষার সৃষ্টি করবে। এই ভাষা একাধারে সৌরভ, ঝঙ্কার, বর্ণ এবং চিন্তার আড়ালে সেই সত্তা যা চিন্তাকে বিধৃত করে তাকে নিজের দিকে টেনে এনে সবকিছুকে একাধারে প্রকাশ করবে। বলাবাহুল্য, এ ভাবধারা বহুদিন পর্যন্ত সাহিত্যে চলেছিল। কিন্তু যখনই যুক্তিযুগের শুভ সূচনা হতে থাকে তখন থেকে সাহিত্যে এর প্রভাব পড়তে থাকে। অর্থাৎ সাহিত্যে গণিতের প্রভাব পড়তে দেখা যায়। গণিত যেহেতু মূল বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিকভাবে তুলে ধরে সেইহেতু একদল সাহিত্যিক সেই সময় থেকেই ভাবতে শুরু করছেন সাহিত্যের ভাষা গণিতের প্রতীকের মত সঠিক এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফলে বীজগণিতের ভাষাই এঁদের কাছে আদরণীয় হতে থাকে। অর্থাৎ সাহিত্যে যে ভাব আমরা প্রকাশ করবো তার বাক্যবিন্যাসে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিপূর্ণভাব বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। বিখ্যাত গণিতবিদদ্বয় রেণে দেকার্ত এবং লাইবনিৎস্ বলেছিলেন—"আমাদের চিন্তায় যে ভাব রয়েছে সেখানে প্রতীকের সাহায্য নিলেই সুবিধা হয়"। বলাবাহুল্য, গণিতের প্রভাবের ফলেই সাহিত্যিকরা তাঁদের ভাষা কিছুটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। পছন্দমতো প্রতীক কোন ভাবধারার পরিবর্তে তাঁরা ব্যবহার করতে থাকেন। যেমন বীজগণিতে অজ্ঞাত রাশির পরিবর্তে x প্রতীক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ভাবধারা নিউটনীয় যুগে বেশী দেখা যায়। এই যুগে ইংরাজী সাহিত্যে নিউটনীয় প্রভাব পড়ার ফলে ইংল্যাণ্ডের জ্ঞানীগুণীরা ভাষা সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গড়ে তোলেন।

অর্থাৎ তখন থেকেই সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতায় গণিতের মত মূল অথচ সংক্ষিপ্ত ভাবের প্রভাব পড়তে থাকে। অর্থাৎ কবি বা সাহিত্যিকরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গণিতবিদদের ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এ সম্পর্কে ড্রাইডেন বলেছেন—"A man should be learned in several sciences, and should have a reasonable Philosophical and in some measure a Mathematical head to be a complete and excellent poet .." ।

গাণিতিক স্বীকার্য যেমন কোন গাণিতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে এর আকার এবং বিষয়বস্তু রচনার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে ঠিক তেমনভাবে কবিতার বেলাতেও দেখা যায়। এমন একটা সময় ছিল যখন কবিতার নাম শুনলে লোকে উন্নাসিক ভাব দেখাতো। এমনকি দান্তে, মিল্টন প্রমুখের রচনাকেও অনেকে উন্নাসিকভাবে পড়তো। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি গদ্য সাহিত্যক কবিতার চেয়ে প্রিয় বলে মনে করতেন। তাঁরা ভাবতেন কবিতার মধ্যে শুধুমাত্র ভাবাবেগ ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান নেই। বিখ্যাত দার্শনিক লক বলেছেন "Poetry merely offered pleasent picture and agreeable vision" নিউটনের শিক্ষক আইজ্যাক ব্যারো বলতেন—"Poetry was a kind of ingenious non-sense" হিউম বলতেন "Poetry was the work of professional liars who sought to entertain by fictions"। সাহিত্যের ইতিহাস যদি পুংখানুপুংখভাবে পাঠ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যুক্তির যুগে পদ্যের চেয়ে গদ্যই বেশী সমাদৃত ছিল। সম্ভবতঃ নিউটনীয় চেতনা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করার ফলেই কবিতা এবং গদ্য সাহিত্যের মধ্যে একটি পার্থক্যের সীমারেখা টানা হতে থাকে। গদ্য হচ্ছে মানুষ যা চিন্তা করে এবং বিচার করে কিন্তু মানুষ যা অনুভব করে তা হচ্ছে কবিতা। গদ্য ঘটনাকে বিচার করে কিন্তু কবিতা আনন্দ ও সৌখিনতাকে নিয়ে কাজ করে। নিউটনীয় যুগে জ্ঞান ছিল পরিষ্কার গাণিতিক বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত, সুতরাং কবিতার ক্ষেত্রে যে বাহুল্য ভাব দেখা যায় তা বর্জন করা হতে থাকে ফলে কবিতার মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। বলা যেতে পারে গাণিতিক সত্যকে কবিতা বড় জোর সুসজ্জিত করতে পারে। মনে হয় যুক্তির যুগে কবিতার প্রতি এ এক অঘোষিত যুদ্ধ। লক বলতেন যুক্তি সত্যের দিকে কিন্তু কবিতায় এ সব কিছু নেই। কবিতা মানুষের জীবনে প্রয়োজন নেই। সুতরাং কবিতার জন্য চিন্তা ব্যয়

করা বাতুলতা মাত্র। বলা বাহুল্য, কবিতায় যে আনন্দ তাকে যুক্তির এবং বিষয় বস্তুর সাহায্যে নস্যাৎ করা যেতে পারে। আবার এ মতের বিরুদ্ধতাও কেউ কেউ করেছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাষা ছিল বর্ণময় ও ছবির মতো। কিন্তু সাহিত্যে গণিতের প্রভাব হেতু কবিতার মূল লক্ষ্য ও ধারণা ব্যাহত হয়েছিল। ব্লেক, কলেরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ল্যাম্ব, বাইরণ, কীটস, শেলী প্রমুখ কবি এবং সাহিত্যিকেরা এই ধারণা পোষণ করতেন। যদিও গণিত কি এবং কেন এর প্রয়োজন সে সম্পর্কে এঁদের ধারণা স্পষ্ট ছিল। এঁরা জানতেন যুক্তি নিজেকে এবং অপরকে বঞ্চনা করে। বিজ্ঞান মানুষকে শক্তি দিয়েছে কিন্তু জ্ঞান দেয় নি। উপরন্তু মানুষের সুখ ও নৈতিকবোধকে কেড়ে নিয়েছে। ব্লেক বলেছেন যুক্তি হচ্ছে একটি দানব এবং এ দানবকে লালন পালন করেছেন নিউটন এবং লক। নিউটনের পর থেকেই নিউটনীয় চেতনা সাহিত্য প্রভাব বিস্তার করায় ল্যাম্ব এবং কীটস মন্তব্য করেছিলেন—"নিউটন কবিতাকে ধ্বংস করেছেন।" শিল্পশৈলী বা কবিতা মানব জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনীকে বিধৃত করে কিন্তু গণিত এ সবের মূল্য দেয় না। হয়তো কবিতায় যে কল্পনা রয়েছে তাকে কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। শেলী বলতেন কল্পনাই নৈতিকতার একটি বিশেষ যন্ত্র এবং কবিতা এক্ষেত্রে কিছুটা কল্পনার কাজ করে। যাই হোক, একথা সত্য যে নিউটনের পরবর্তী সময়ে অনেক কবিতায় গণিতের প্রভাব পড়তে থাকে। অর্থাৎ অনেকে কবিতায় গাণিতিক তথ্য ও তত্ত্ব সংযোজিত করতে থাকেন। আবার কেউ কেউ গাণিতিক কবিতা লিখতে থাকেন। অবশ্য এর মধ্যে অনেকের প্রথম জীবনের কবিতায় গণিতের প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে গণিতের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা বলা যায়। এঁর প্রথম দিকের কবিতায় গণিতের প্রভাব রয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে এঁর কবিতায় গণিতের প্রভাব দেখা যায় না।

কবিতায় গণিতের প্রভাব রয়েছে এমন কবিদের মধ্যে সামুয়েল বাটলারের নাম প্রথমেই করতে হয়। ইনি 1663 খ্রীষ্টাব্দে Hudibras[১]'এ বলেছেন—

১. Samuel Butler—Hudibras, Part 1, Canto 1, lines 119—126

In Mathematicks he was greater
Than Tycho Brahe, or Erra Pater :
For he, by Geometrick scale,
Could take the size of Pots of Ale ;
Resolve by Signs and Tangents streight,
If Bread or Butter wanted weight ;
And wisely tell what hour o'th' day
The Clock doth strike, by Algebra.

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কবিতাটির মধ্যে গণিতের প্রভাব রয়েছে। এ কথা সত্য যে সাধারণ মানুষ এবং সাহিত্যিকরা গণিত সম্পর্কে প্রায়ই একই মনোভাবের শিকার হন। আবেগ নিরপেক্ষ ও সংজ্ঞা প্রসূত যে গাণিতিক তত্ত্ব বা বিতর্কসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্বকলাপরূপ যে গাণিতিক চিন্তা তার প্রতি সাহিত্যিকরা কোন দিনই আকৃষ্ট হন নি। অবশ্য কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক গাণিতিক চিন্তার সদা অগ্রসর দিকটা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তবে তা অনেকক্ষেত্রে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ফলশ্রুতির বা কথা প্রসঙ্গে গণিতের উপমার সাহায্য নিয়েছেন। সাহিত্যে গণিতের উপমার কথা পরে আসছি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে চিরায়ত (classical) সাহিত্যের ভাণ্ডারে কয়েকটি মাত্র কবিতা আছে সেখানে গণিতের অনেক গুরু গম্ভীর তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একজন অজ্ঞাতনামা ইংরাজ কবির লেখা গাণিতিক তত্ত্বে পরিপুষ্ট একটি দীর্ঘ কবিতার উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। কবিতাটির নাম Songs of the Screw[১]

A moving form or rigid mass,
Under whate' er conditions
Along successive screws must pass
Between each two positions.
It turns around and slides along—
This is the burden of my song.

১. Robert Edouard Moritz—On mathematics, Page 320

The pitch of serew, if multiplied
By angle of rotation,
Will give the distance it must glide
In motion of translation.
Infinite pitch means pure translation,
And zero pith means pure rotation.

Two motions on two given screws,
With amplitudes at pleasure,
Into a third screw-motion fuse,
Whose amplitude we measure
By parallelogram construction
(A very obvious deduction).

Its axis cuts the nodal line
Which to both screws is normal,
And generates a form divine,
Whose name, in language formal,
Is 'surface-ruled of third degree.'
Cylindroid is the name for me.

Rotation round a given line
Is like a force along,
If to say couple you decline,
You're clearly in the wrong ;—
'Tis obvious, upon reflection,
A line is not a mere direction.

So couples with translations too
In all respects agree ;

And thus there centres in the screw
A wondrous harmony
of Kinematics and of Statics,—
The sweetest thing in mathematics.

The forces on one given screw,
With motion on a second,
In general some work will do,
Whose magnitude is reckoned
By angle, force, and what we call
The coefficient virtual.

Rotation now to force convert,
And force into rotation ;
Unchanged the work, we can assert,
In spite of tranformation.
And if two screws no work can claim,
Reciprocal will be their name.

Five numbers will a screw define,
A screwing motion, six ;
For four will give the axial line,
One more the pitch will fix ;
And hence we always can contrive
One screw reciprocal to five.

Screws—two, three, four or five, combined
(No question here of six),

Yield other screws which are confined
Within one screw complex.
Thus we obtain the clearest notion
Of freedom and constraint of motion.

In complex III, three several screws
At every point you find,
Or if you one direction choose,
One screw is to your mind ;
And complexes of order III.
Their own reciprocals may be.

In IV, wherever you arrive,
You find of screws a cone,
On every line of complex V.
There is precisely one ;
At each point of this complex rich,
A plane of screws have given pitch.

But time would fail me to discourse
Of Order and Degree ;
Of Impulse, Energy and Force,
And Reciprocity.
All these and more, for motions small,
Have been discussed by Dr Ball.

এক কথায় বলা যায় কবিতায় এ ধরণের গাণিতিক তত্ত্ব আর কোন কবিতায় নেই এবং এটি গণিত ও কবিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। আধুনিক গণিতশাস্ত্রে রীমানীয় অনুকলন (Riemannian Integral) একটি উল্লেখযোগ্য

বিষয়। এর সংজ্ঞা অতি জটিল ব্যাপার। কিন্তু কবিতার মাধ্যমে এই রীমানীয় অনুকলনটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কবিতাটি হচ্ছে এই—

you take the interval from a to b
and divide it in on pieces arbitarily ;
Find the maxmium of f in each of little bit
And multiply the length of that bit by it
Now add up product that's the upper sum—
But don't stop there because there's more to come,
Find the minimum of f in each little bit
And multiply the length of that bit by it
Then add up the products as you did before
That's the lower sum, but there still is more.

Now you send n to infinity
So the lengths tends to zero simulteneously
Then the upper sums get smaller by they're bounded below
But all of the lower sums (its easy to show)
While the lower sums gets bigger and keep clossing in
And of the gap between gets so very thin
That there's only room for one quantity
The that's the integral from a to b
[Intergal Doggerel by D Merriell. inspired by Tom Lehreor's "The Derivative Song"]

জোনাথন, সুইফটের রচনায় বহুক্ষেত্রে বিদ্রূপাত্মক ভাব দেখা যায়। তবে আবার তাঁর রচনায় গণিতের প্রভাবও রয়েছে। তাঁর রচিত গ্যালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুংখানুপুংখভাবে যদি পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে তিনি গণিতে বিভিন্ন বক্ররেখা যেমন সাইক্লয়েড, রম্বয়েড প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লাপুটা ভ্রমণের কিছুটা অংশ তুলে ধরছি। "……দুই প্রস্থ

খাবার এলো, একেক প্রস্থ আবার তিনটি করে পদ। প্রথমে ভেড়ার কাঁধের মাংস, সমকোণী ত্রিভূজের আকারে কাটা, তারপর এলো গরুর মাংস, জ্যামিতির রম্বয়ডের আকারে কাটা, আর একটা সাইক্লয়েডের আকারে পুডিং......।[১] বলা বাহুল্য জ্যামিতির বিভিন্ন বক্ররেখার উপর ভিত্তি করে এ ধরণের উপমা সত্যই দুর্লভ। সাধারণ সাহিত্যে উপমা দিতে গেলে নারীর দেহের বিভিন্ন অংশের উপর সাদৃশ্যগত বর্ণনাই দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে জোনাথন সুইফটের উপমা কিছুটা নূতনত্বের দাবী করতে পারে। এই লাপুটা ভ্রমণের অন্য একজায়গায় বলেছেন "শিক্ষক মহাশয় তাঁর একটি বই থেকে সূর্য, চাঁদ, তারা, রাশিচক্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ও মেরুচক্র ইত্যাদির ছবি আর অনেকগুলি জ্যামিতিক সমতল ও ঘনক্ষেত্রের নক্সা দেখালেন।"[২] যতদূর মনে হয় গণিত শাস্ত্রের আধুনিকতম শাখা সাইবারনেটিকসের ধারণা জোনাথন সুইফটের রচনায় ছিল। অন্ততপক্ষে লাপুটা ভ্রমণ প্রসঙ্গে এই সাইবারনেটিকসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন "এবার ভাষা বিন্যাস শেখার ব্যাপারে আমাদের গণিতবিদ্যা খুব কাজে এলো ; কারণ এদের ভাষার ভিত্তি হলো অঙ্ক ও সঙ্গীত শাস্ত্রের উপরে। আর শেষোল্লেখিত বিষয়েও আমি নিতান্ত অপুট ছিলাম না। মনের ভাব প্রকাশ করে ওরা ক্রমাগত রেখা ও জ্যামিতিক চিত্রের শরণ নেয়, যেমন কোন নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রম্বস, বৃত্ত, সামান্তরিক, উপবৃত্ত ইত্যাদি নানা জ্যামিতিক শব্দ ব্যবহার করে, নয়তো সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রচলিত সব পদ ব্যবহার করে ; সেগুলি এখানে উল্লেখ করে কাজ নেই। রাজার পাকশালেও গণিত ও সঙ্গীত শাস্ত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি দেখলাম, এগুলির আকৃতি দেখে, মহারাজের টেবিলে পরিবেশন করার জন্য মাংস কাটা হয়।"[৩] এরপর জোনাথন সুইফট লিখেছেন— "এঁদের বাড়ী ঘর বিশ্রীভাবে তৈরী, দেওয়াল-গুলো তেড়াবাঁকা, ঘরের মধ্যে কোথাও সমকোণ নেই। এই খুঁতগুলির কারণ হোলো ব্যবহারিক জ্যামিতির প্রতি এঁদের দারুণ অশ্রদ্ধা। ব্যবহারিক জ্যামিতির নাকি আভিজাত্য নেই। তাঁরা নিজেরা যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপদেশ দেন তা সে সব কারিগরদের বোঝার বাইরে। কাজেই ক্রমাগত

---

১. গ্যালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত—অনুবাদ করেছেন লীলা মজুমদার, পৃঃ ১৭৮

২. ঐ পৃঃ ১৭৭. ৩. ঐ পৃঃ ১৮১.

কাজে ভুল হতে থাকে। যদিও কাগজে কলমে এঁরা ভারী বিজ্ঞ, তবু এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে একটা রুল ধরতে কি পেন্সিল চালাতে, কি একটা বিভাজক ব্যবহার করতে গিয়ে কিম্বা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজকর্মে এঁদের মতো আনাড়ি অকেজো লোক আমি কোথাও দেখিনি। আরও দেখলাম যে অঙ্ক আর সঙ্গীত ছাড়া অন্য সব বিষয়ে কিছু ধারণা করতে গেলেই এঁরা বিমূঢ় ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন।……পূর্বোল্লিখিত দুটি বিষয়ের, যথা অঙ্ক ও সঙ্গীত শাস্ত্রের ক্ষেত্রের মধ্যে ওঁদের সমগ্র ভাবের ও চিন্তার ক্ষেত্র সীমিত।[১]

ও দেশের অধিকাংশ লোকেরই, বিশেষ করে যাঁরা গ্রহ বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করে থাকেন তাঁদের জ্যোতিষশাস্ত্র মতে গণনা ইত্যাদিতে গভীর বিশ্বাস, অবিশ্যি একথা তাঁরা সর্বজন সমক্ষে স্বীকার করতে লজ্জা পান। কিন্তু যা দেখে আমার সবচেয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হয় এবং যেটা আমার কাছে একাধারে যুক্তি রহিত বলে মনে হোতো, সেটা হোলো সংবাদ ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে এঁদের প্রবল আকর্ষণ। সদাই জনসাধারণের সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই, বা যাবতীয় রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করা চাই। ইউরোপেও যত গণিতশাস্ত্রবিদ দেখেছি তাঁদের মধ্যেও এই প্রবণতাটি সর্বদা লক্ষ্য করেছি অথচ এই দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কটা যে কোথায় তা কোনদিনই আবিষ্কার করতে পারি নি। এক যদি এঁরা মনে করেন যে যেহেতু ক্ষুদ্রতম বৃত্তের কেন্দ্রেও যতগুলি ডিগ্রী, বৃহত্তম বৃত্তেও তাই, অতএব ভূগোলক নিয়ে ঘাঁটা ঘাঁটি করতে যতখানি বিদ্যার প্রয়োজন পৃথিবীর আইনবিধান ও শাসন ব্যাপারেও তার বেশী লাগতে পারে না।[২]

জোনাথন সুইফট তাঁর সাহিত্যে শুধু গণিতের কথা বা জ্যামিতির বিভিন্ন বক্ররেখার কথাই উল্লেখ করেন নি। তিনি তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে যে পদ্ধতিতে গণিতশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হোতো তার সমালোচনা করে গ্যালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। তিনি লাপুটা ভ্রমণের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ দিকে বলেছেন—"এরপর গণিতভবনে গিয়ে দেখি মাষ্টার মশাই ছাত্রদের যে নিয়মে অঙ্ক শেখাচ্ছেন ইউরোপে তা কেউ কল্পনা করতে পারে না। অঙ্কের প্রতিপাদ্য ও প্রমাণ দুইই লিখে রাখতে হয় পাতলা একটি বিস্কুটের উপরে।

১. ঐ পৃঃ ১৮১—১৮২ ২. ঐ পৃঃ ১৮২

যে কালি দিয়ে লিখতে হয় সেটি হোলো মস্তিষ্কের উপযোগী এক রকম আরক। বিস্কুটটা ছাত্রকে খালি পেটে গিলে খেতে হয়; তারপর তিনদিন একটু জল আর রুটি ছাড়া আর কিছু খায় না। যেমন হজম হতে থাকে, আরকটি মস্তিষ্কের দিকে উঠতে থাকে এবং আরকের সঙ্গে অঙ্কও মাথায় ওঠা উচিত। এই প্রক্রিয়ার এখনো কোন নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যায় নি। তার খানিকটা কারণ হচ্ছে বিস্কুট রচনায় উপকরণের পরিমাণ ভুল হয়। আর খানিকটা কারণ হচ্ছে ছেলেগুলো বেয়াড়া। বিস্কুটের বড়ি খেতে তাদের বমি আসে, তাই তারা ওষুধের গুণ ধরবার আগেই লুকিয়ে সবটাকে বমি করে তুলে দেয়। তাছাড়া ওষুধের নিয়ম অনুসারে অতদিন খাওয়া দাওয়ার কড়াকড়ি মেনে চলতে আজ অবধি তাদের রাজি করানো যায়নি।[১]

বলা বাহুল্য, এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই রচনায় শ্লেষ মিশ্রিত রয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গণিতের উপর ভিত্তি করে শ্লেষযুক্ত রচনা খুব বেশী একটা দেখা যায় না। মাত্র দুটি রচনা আমাদের চোখে পড়ে। দুটি রচনাই শ্রীগণিতবিদ ছদ্মনামের আড়ালে কোন গণিতবিদের রচনা। রচনা দুটির নাম (১) কলিকাতা মাথামাটি সংঘ। (২) বারোইয়ারী গণিত পরীক্ষা। দুই রচনাই গণিতজগৎ নামে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গণিতের একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এ লেখার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও কালিপ্রসন্ন সিংহের রচনাগুলির প্রভাবই বেশী।

যা হোক সাহিত্যে স্থূল বর্ণনা, সূক্ষ্ম বর্ণনা এবং ব্যঙ্গোক্তির আলোচনা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যে পরোক্ষ ও মূলত গাণিতিক উপমাশ্রিত বর্ণনার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই দান্তে রচিত ডিভাইন কমেডির তেত্রিশ সর্গের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। দান্তে লিখেছেন—"হে অনন্ত জ্যোতি তুমি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আপন প্রেমের মহিমায় সতত পরিপূর্ণ। তোমার সন্তান খ্রীষ্টের মানবিক রূপ দর্পনে প্রতিবিম্বিত আপন রূপের মত প্রত্যক্ষ করলাম।" বলা বাহুল্য দান্তে তাঁর অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে না পেরে গাণিতিক উপমার সাহায্য নিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

১. ঐ পৃঃ ২০৮

As one
Who vers'd in geometric lore, would fain
Measure the circle ; and, though pondering long
And deeply, that beginning, which he needs,
Finds not ; e'en such was I, intent to scan
The novel wonder, and trace out the form,
How to the circle fitted, and therein
How plac'd : but the flight was not for my wing[১]

এটির অনুবাদ করলে এরূপ হবে—"জ্যামিতিতত্ত্ব বিশারদেরা যেমন শত চেষ্টা করেও কোন বৃত্তের সম পরিমাণ কোন বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত করতে পারেন না অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রের মতো কোন বৃত্তকে যথাযথভাবে মাপতে পারে না তেমন আমিও শত চেষ্টাতেও আমার সেই অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে আমার মানসপটে অঙ্কিত করে রেখে দিতে পারলাম না।" এটি একটি চমৎকার উপমা। একটি উৎকৃষ্ট গাণিতিক চিন্তাকে এভাবে উপমার সাহায্যে সাহিত্যে প্রয়োগ করা সত্যিই বিরল। বৃত্তকে বর্গে এবং বর্গকে বৃত্তে পরিণত করার সঙ্গে যে প্রশ্নটি জড়িত আছে তা হচ্ছে একটিকে অন্যটিকে রূপান্তরিত করা গেলেও একেবারে ঠিক হয় না এবং এটি সেই আদিকাল থেকে অমিমাংসিত অবস্থায় আছে। দান্তে যে সময়ের লোক সে সময় এটি একটি চিরায়ত (classical) গাণিতিক চিন্তার অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হতো। সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদ হয়েও তিনি এত উচ্চাঙ্গের গাণিতিক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জেনে আমরা কিছুটা অবাক হয়ে যাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এত উচ্চাঙ্গের গাণিতিক তত্ত্বের প্রয়োগ সমকালীন বা তার পরেও বেশী নজরে পড়ে না। যদিও ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনায় গণিতের প্রভাব রয়েছে তবে সে প্রভাব পরবর্তীকালে হ্রাস পেয়েছে। একথা ঠিক ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে সময়ের লোক তখন সাহিত্য এবং বিজ্ঞান একটি উৎকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং এর প্রভাব ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনায় থাকা স্বাভাবিক। যাই হোক ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রসঙ্গ নিয়ে পরে বলছি। কবি টেনিসন তার প্রিন্সেস কবিতায় উপমার সাহায্য নিয়েছেন। তবে এই উপমাতে কোন গাণিতিক

১. Paradise (carey), canto 33, lines 122-129

তত্ত্ব সংযোজিত হয়নি। শুধু মাত্র গাণিতিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

On the lecture slate
The circle rounded under female hands
With flawless demonstration.[১]

গাণিতিক তত্ত্বের বর্ণনায় সংজ্ঞাশ্রিত ঋজুতা থাকবে এবং অপর দিকে সাহিত্যে কুহকময়, বহুধ্বনিময় শুদ্ধতা থাকবে। ফলে বহু গণিতবিদ এবং সাহিত্যিক ভেবে থাকেন এই দুটি শাখার মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসন কেমন করে হবে। এ মতধারার প্রভাব বহু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেক্সপীয়রের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি গণিতকে ঠিক সুনজরে দেখেন নি। যদিও তিনি "টেমিং অব দি শ্রু" নাটকে গণিতকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি নানা রকমের মনুষ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং এই সব চরিত্রে কখনও কখনও গণিতের প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য টেমিং অব দি শ্রু'তে সমসাময়িক আবিষ্কৃত কোন গাণিতিক তত্ত্ব নেই তবে গাণিতিক চিন্তার প্রভাব এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায় ভিনসেনশিওর পুত্র লুসেনশিও পিশা ছেড়ে পদুয়াতে উচ্চ শিক্ষার জন্য আসেন। তিনি নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের সেই অংশ পাঠ করতে চেয়েছিলেন যা জীবনে প্রকৃত সুখ দেবে। এ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য ত্রানিওকে তাঁর মনের কথা জানালে ত্রানিও কিন্তু নীতি-জ্ঞানের গুণগান করলো না বরং বলতে লাগলো—

Music and poesy used to quicken you :
The mathematics, and the metaphysics,
Fall to them as you find your stomach serves you.
No profit grows, where is no pleasure ta'en :—
In brief, sir, study what you most affect.'[২]

অর্থাৎ 'গণিত ও অধিবিদ্যা পাঠ করুন ক্ষতি নেই। কিন্তু তার সঙ্গে কাব্য সঙ্গীতবিদ্যাও শিক্ষা করুন। যে বিদ্যার মধ্যে কোন বাঁচার আনন্দ পাওয়া

১. Tennyson—The Princes 11, 493. 1.
২. Shakespeare—Taming of the Shrew act 1, scene l.

যায় না তাতে বিশেষ লাভ হয় না।' বলা বাহুলা উক্তিটি ভৃত্যের মুখ থেকে নির্গত হলেও এটি সেক্সপীয়রের নিজের মনের কথা। সেক্সপীয়র হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন গণিত কখনও বাঁচার জন্য কিছু করবে না। গণিতচর্চা শুধুমাত্র আর্ট, অন্য কিছু নয়। হয়তো তখনকার দিনে গণিতের প্রতি বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল এবং সেইহেতু সেক্সপীয়র তাঁর টেমিং অব দি শ্রু'তে সেটা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। গণিতের প্রতি হয়তো সেক্সপীয়রের বিরূপ মনোভাব থাকলেও যেহেতু তখনকার দিনে গণিত শিক্ষা অপরিহার্য ছিল সেইহেতু সে কথা এই নাটকের এখানে এবং অন্যত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি টেনিং অব দি শ্রু'র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে একজন গণিতজ্ঞকে হাজির করিয়েছেন। এখানে ভেরোনার পেত্রুশিও হর্তেনশিও নামে একজন গণিতবিদকে নিয়ে বাপিস্তা নামে পুদুয়ার এক ভদ্রলোকের নিকট উপস্থিত হলেন এবং কথা প্রসঙ্গে বললেন—

I do present you with a man of mine,
Cunning in music and in mathematics,
To instruct her fully in those sciences,
Whereof, I know, she is not ignorant'[১]

অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে—সঙ্গীত ও গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে এনেছি যিনি আপনার কন্যাকে এই সব শাস্ত্র শিক্ষা দেবে। আমি জানি আপনার কন্যা এসব জানে। বলা বাহুল্য ভেইমস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাম্বিওকে তিনি ক্যাথারিনের পাণিপ্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলেন যিনি গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বর্তমান উপমহাদেশীয় সাহিত্যে নায়ক হয় আই. এ. এস না হয় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়র। কিন্তু পূর্বে নায়ককে বেশ কিছু ক্ষেত্রে গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলে তুলে ধরা হোতো। যেমন শরৎচন্দ্রের বড়দিদি উপন্যাসে নায়ককে গণিতে সুপণ্ডিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্যেটে তাঁর বিভিন্ন রচনায় গণিত নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভিলহেম মেস্তারে তিনি গণিত সম্পর্কে কিছুটা সংজ্ঞা ঘেঁষা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

১. Shakespeare—Taming of the Shrew act 2, Scene 1.

"Mathematics, like dilectics, is an organ of the inner higher sense ; in its execution it is an art like eloquence. Both alike care nothing for the content, to both nothing is of value but the form. It is immaterial of mathematics whether it computes pennies or guineas to rhetoric whether it defends truth on error.'[১]

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো প্রখ্যাত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কবিতায় জ্যামিতি ও কবিতাকে জীবনের সঙ্গী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় কাব্যের সব গুণগুলি ধরা পড়লেও গণিত ও কবিতায় এই যে মিলন তা খুব কম কবির রচনার মধ্যে দেখা যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'Prelude' কবিতায় বলেছেন—

On poetry and geometric truth,
And their high privilege of lasting life,
From all internal injury exempt,
I mused ; upon this chiefly and at length,
My senses yielding to the sultry air,
Sleep seized me, and I passed into a dream[২].

গণিতপ্রীতি ও গাণিতিক চিন্তাধারাকে বিসর্জন না দিয়েও কবি বা সাহিত্যিক হওয়া যায় সে প্রমাণ যুগে যুগে দেখা গিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'The Prelude থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি—

Yet may we not entirely overlook
The pleasures gathered from the rudiments
Of geometric science. Though advanced
In these inquires, with regret I speak,
No farther than the threshold, there I found
Both elevation and composed delight :
With Indian awe and wonder, ignorance pleased
With its own struggles, did I meditate

১. Wilhelm Meisters Wanderjhare, Zweites Buch.
২. The Prelude, BK-5

On the relations those abstractions bear
To Nature's laws

... ...

More frequently from the same source I drew
A pleasure quiet and profound, a sense
Of permanent and universal sway,
And paramount belief ; there recognized
A type, for finite natures, of the one
Supreme Existence, the surpassing life
Which to the boundaries of space and time,
Of melancholy space and doleful time,
Superior and incapable of change,
Nor touched by welterings of passion—is,
And hath the name of God. Transcendent peace
And silence did wait upon these thoughts
That were a frequent comfort to my youth.

... ...

Mighty is the charm
Of those abstractions to a mind beset
With images and haunted by himself,
And specially delightful unto me
Was that clear synthesis built up aloft
So gracieully even then when it appeared
Not more than a mere plaything, or a toy
To sense embodied : not the thing it is
In verity, an independent world
Created out of pure intelligence.[১]

---

১. The Prelude, Bk—6

ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'The Prelude' গ্রন্থের অন্য জায়গায় বলেছেন

'Tis told by one whom stormy waters threw,
With fellow-sufferers, by the shipwreck spared,
Upon a desert coast, that having brought
To land a single volume, saved by chance,
A treatise of Geometry, he wont,
Although of food and clothing destitute,
And beyond common wretchedness depressed,
To part from company, and take this book
(Then first a self taught pupil in in its truths)
To spots remote, and draw his diagrams
With a long staff upon the sand, and thus
Did oft beguile his sorrow, and almost
Forget his feeling : [১]

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কিছু কবিতা আছে যা গাণিতিক উপমায় অলংকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর রচনা 'The Prelude' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

But who shail percel out
His intellect by geometric rules,
Split like a province into round and square ?[২]

সাহিত্য ও গণিত এই দুই কৃষ্টির মাঝখানে যে লৌহ যবনিকা তার অপর অঞ্চল থেকে ভেসে আসছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা। কীটসের মত ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইন্দ্রধনু ভক্ত ছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কল্পনাকে বেশী মূল্যবান মনে করলেও তিনি আর্কিমিদিস, নিউটন প্রমুখ গণিতজ্ঞদের শ্রদ্ধা করতেন। আর্কিমিডিস সম্পর্কে 'The Excursion' কবিতায় তিনি বলেছেন—

Call Archimedes from his buried tomb
Upon the plain of vanished Syracuse,

---

১. ঐ

২. The Prelude, Bk—2

And feelingly the sage shall make report
How insecure, how baseless in itself,
Is the philosophy, whose sway depends
On mere material instruments—how weak
Those arts, and how inventions, if unpropped.
By virtue.

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো জার্মান কবি Schiller আর্কিমিদিস সম্পর্কে সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। তিনি বলেছেন—

Zu Archimedes kam e nst ein wissbegicriger Jungling.
'Weihe mich" sprach er zu ihm, "ein in die gottliche Kunst,
Die so herrliche Frucht dem Vaterlande getragen,
Und die Mauern der Stadt vor der Sambuca beschutzt !
'Gottlich nennst du die Kunst ? Sie ists, versetzeder Weise ;
Aber das war sie, mein Sohn, eh sie dem Staat noch gedient.
Willst du nur Fruchte von ihr, die kann auch die Sterbliche zeugen,
Wer um die Gottin freit, suche in ihr nicht das Weib.'

এই কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদে বলা হয়েছে—

To Archimedes once came a youth intent upon knowledge:
Said he 'Initiate me into the science divine,
Which to our country has borne glorious fruits in abundance,
And which the walls of the town 'gainst the Sambuca protects"
"Callst thou the science divine ? It is so, the wise man responded ;
But so it was, my son, ere the state by her service was blest.
Would'st thou have fruit of her only ? Mortals with that can provide thee,
He who the goddess woul l woo, seek not the woman in her."

এই দুটি কবিতা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে কবি তাঁর আবেগ আর বোধ দিয়ে ধরণীব্যাপ্ত মনুষ্যত্বের অতিরিক্ত সাম্রাজ্যকে সংহত করলেও অনেক সময় তাঁর কবিতায় সমসাময়িক কালের গণিত বা পূর্বকালের গণিত বা গণিতবিদদের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

গণিতবিদ মূলত যদিও ব্যক্তির একান্ত উপলব্ধির চেয়ে অন্যতম দীনতর অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যাপৃত, তবু কবির দৃষ্টিতে গণিতবিদ একাকী, সাধারণ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে নেওয়া এক সত্তা। গণিতবিদ যে সত্য অনুসন্ধান করেন তা অন্তর্মগ্ন জীবনের উপলব্ধ সত্য নয়, তার সত্য বহিরাগত। শুধুমাত্র যুক্তি আশ্রিত ব্যাখ্যার বিজ্ঞানে সুশৃঙ্খলভাবে বিধৃত এই সত্য এবং এই শৃঙ্খলাও আরোপিত হয় বিমূর্ত ধারণা ও উপযুক্ত কল্পনার উপর ভিত্তি করে। তবু অনেক সময় গণিতবিদরা কবিদের প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে গণিত ও কবিতার মধ্যে কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটাতে চেষ্টা করেন। সে কবিতা হয় এক অপূর্ব স্বাদের। একটি দৃষ্টান্ত দিলে আলোচনাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। প্রখ্যাত গণিতবিদ সি. জি. জে জ্যাকোবি গণিত ও কবিতার মধ্যে একটি সংযোগ সাধন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

Zu Archimedes kam ein wissbegieriger jungling
Weihe mich, sprach er zu ihm, ein in die gottliche Kunst,
Die so herrliche Dienste der Sternenkunde geleistet,
Hinter dem Uranos noch einen Planeten entdeckt.
Gottlich nennst Du die Kunst, sie ist's, versetzte der Weise,
Aber sie war es, bevor noch sie den Kosmos erforscht,
Ehe sie herliche Dienste der Sternenkunde geleistet,
Hinter dem Uranos noch einen Planeten entdeckt.
Was: Du im Kosmos erblickst, ist nur der Gottlichen Abglanz
In der Olympier Schaar thronet die ewige Zahl[১]

এটির অবশ্য ইংরাজী অনুবাদ আছে কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হোলো না। বলা বাহুল্য জ্যাকোবীর এই কবিতাটিতে Schiller এর প্রভাব খুব বেশী।

১. Journal fur Mathematik, Bd 101 (1887) P 338

অন্ততঃপক্ষে শব্দ চয়নে দেখা যায় জ্যাকোবী শীলারকে অনুসরণ করেছেন। জ্যাকোবী 1804 খ্রীষ্টাব্দে 10ই ডিসেম্বর প্রুসিয়ার পটাশডামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা সাইমন জ্যাকোবী ব্যাঙ্কার ছিলেন। কার্ল গুস্তব জ্যাকোবী প্রথমে ভাষাতত্ত্বের প্রতি আগ্রহান্বিত হন পরে গণিতে উৎসাহী হন। জ্যাকোবী গণিতের বিভিন্ন শাখার উপর গবেষণা করেছেন। তবে $x^5-10q^2x=p$ এই সমীকরণটির সমাধান করে তিনি গণিতশাস্ত্রে স্থায়ী আসন দখল করে গিয়েছেন। 1826 খ্রীষ্টাব্দে কনিসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষক (lecturer) হিসাবে যোগ দেন। এখানে ছয় মাস অধ্যাপনা করার পর বার্লিনে যান। 1829 খ্রীষ্টাব্দে New Foundation of the theory of elliptic function—এর উপর গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন।

গণিতবিদদের মধ্যেও সাহিত্যপ্রীতি আছে, তাঁরাও কবিতা লিখতে পারেন এবং সে কবিতা সেক্সপীয়র বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো কাব্যধর্মী না হলেও মোটামুটি কাব্যগুণে সিক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ হ্যামিলটন রচিত বিখ্যাত গণিতবিদ ফোরিয়ার সম্পর্কে কবিতাটির উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো—

Fourier ! with solemn and profound delight,
Joy born of awe, but kindling momently
To an intense and thrilling ecstacy,
I gaze upon thy glory and grow bright :
As if irradiate with beholden light ;
As if the immortal that remains of thee
Attuned me to thy spirit's harmony,
Breathing serene resolve and tranquil might.
Revealed appear thy silent thoughts of youth,
As if to cosciousness, and all that view
Prophetic, of the heritage of truth
To thy majestic years of manhood due :
Darkness and error fleeing far away,
and the pure mind enthroned in perfect day.[১]

১. Grave's life of W. R. Hamilton (New york) 1882 voll P 596

অনেকে মনে করেন কবিতা সমস্ত জ্ঞানের আদি এবং অন্ত। যদি কোনদিন গণিতজ্ঞরা গণিতশাস্ত্রে এমন এক বিপ্লব আনতে পারেন যা মনকে সত্যিই অভিভূত করবে তাহলে কবিরাও তাঁদের কাব্যে এসব কথা তুলে ধরবেন। অর্থাৎ গাণিতিক তত্ত্বের পরোক্ষ পরিণামকে অনুসরণ করে গণিতবিদদের পিছু নেবেন তা কিন্তু নয়। সেদিন হয়তো তিনি গণিতসৃষ্ট বিষয়ের রাজ্যে অনুভবকে প্রস্তুত করে দিয়ে গণিতজ্ঞদের সহযোগিতা করবেন। যেমনটি দেখা যায় ক্লেঁ বোতলের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে। এখানে বীজগাণিতিক স্থানিকবৃত্তের (algebraic topology) একটি সংজ্ঞা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে—

A mathematician confided
That a Moebius band is one sided,
And you'll get quite a laugh
If you cut one in half
For it stays in one piece when divided.
A mathematician named Klein
Thought the Moebius band was divine.
Said he, 'if you glue
The edges of two
You'll get a weired bottle like mine.[১]

Moebius strip বা Klein bottle বীজগাণিতিক স্থানিকবৃত্তের একটি উঁচু ধরণের তত্ত্ব। অর্থাৎ স্থানিকবৃত্তের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে এই দুটি। আমরা জানি সাধারণ তলের দুটো দিক আছে। একটি উপর অন্যটি নিম্ন। রুদ্ধতলের (closed surface) উদাহরণ হচ্ছে গোলক (sphere) এবং এমন তল আছে যার সীমানা হোলো বক্ররেখা। এর উদাহরণ হচ্ছে ডিস্ক। এখন এই দুটি তলকে দুটি ভিন্ন রঙে রাঙালে দেখা যাবে যে (ক) যদি তলটি রুদ্ধ হয় তাহলে কখনই দুটি রঙ একত্র হতে পারবে না।

---

১. Topology—135, Mathmatics in the modern world.

(খ) যদি তলটির সীমানা বক্ররেখা হয়ে থাকে তাহলে দুটি রঙ সীমানা বরাবর মিশবে। মঁয়েবিয়াস একটি সুন্দর আলোচনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন যা এককালে এ বিষয়ে যুগান্তর এনেছিল। তাঁর এই আলোচনাটি মঁয়েবিয়াস ষ্ট্রীপ নামে খ্যাত। একটি আয়তক্ষেত্রিক কাগজকে আর্ধমোচড় দিয়ে এর দুটি প্রান্তদেশকে জোড়া লাগানো হয়। তারপর কোন পিঁপড়ে তলবরাবর মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হলে পিঁপড়েটি পুনরায় যে বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেই বিন্দুতে ফিরে আসবে। যাই হোক এ ধরণের অতি উচ্চাঙ্গের গাণিতিক চিন্তা কবিতায় তুলে ধরার ফলে বোঝা যাচ্ছে যে গণিতজ্ঞদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে অতি দূরতম আবিষ্কারকে অন্যান্য বিষয়ের মতো কবি তাঁর শিল্পের উপকরণরূপে গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য যদি কখনও এ সব তত্ত্ব সাধারণ প্রত্যয়ের সীমানার মধ্যে এসে পড়ে। যদি কখনও গণিতের বিভিন্ন শাখার অনুগামীরা সে সব সম্পর্কের রাজ্যে এই সব তত্ত্বকে বিস্তার করেন সেই সম্পর্কের রাজ্য আমাদের জীবন দর্শন স্পর্শনের সীমার মধ্যে আবির্ভূত হয়।

জার্মান সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতায় আধুনিক বীজগণিত নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। এই সব কবিতায় হয়তো কোন গভীর গাণিতিক তত্ত্ব নাই। তবে এখানে গাণিতিক চিন্তার মূল ভাবই আসল। এখানে Lasswitz Kurd-এর জার্মান ভাষায় একটি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ তুলে ধরা হোলো।

Fuchs. To study modern algebra I'm most persuaded.
Meph. 'Twas not my wish to lead thee astray,
But as concerns this science, truly
'Tis difficult to avoid the empty form,
And should'st thou lack clear comprehension,
Scarcely the indices thou'll know apart.
'Tis safest far to trust but one
and built upon your master's formulas.
On the whole—cling closely to your symbols.
Then, for the weal of research you may gain
An entrance to the farmula's sure domain.

Fuchs. The symbol, it must lead to some result ?
Meph. Granted. But never worry about results,
For mind you, just where the results are wanting
A symbol at the nick of time appears.
To symbolic treatment all things yield,
Provided we stay in the general field.
Should a solution prove elusive,
Write the equation in determinant form.
Write what you please, but never calculate.
Symbols are patient and long suffering,
A single stroke completes the whole affair.
Symbols for every purpose do suffice.[১]

প্রখ্যাত গণিতবিদ জে. জে. শিলভাস্টার কবিতার মাধ্যমে বীজগণিতের কোন হারিয়ে যাওয়া সূত্র খোঁজ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

Lone and discarded one ! divorced by fate,
Far from thy wished-for fellows—whither art flown ?
Where lingerest thou in thy bereaved estate,
Like some lost star, or buried meteor stone ?
Thou mindst me much of that presumptuous one
Who loth, aught less than greatest, to be great,
From Heaven's immensity Fell headlong down
To live forlorn, self centred, desolate :
Or who like Heraclid, hard exile bore,
Now buoyed by hope, now stretched on rack of fear,
Till throned Astaea wafting to his ear
Words of dim portent through the Atlantic roar,

১. Der Faust Tragodie (−n) ter Teil ;—Zeitschrift fur mathematischen und naturwissenschaftlichen unterricht Bd 14, p 317.

Bade hem "the sanctuary of the Muse revere
And strew with flame and dust of Isis' shore.[১]

জীবনধারণের পরিপ্রেক্ষিতে বীজগাণিতিক স্থানিকবৃত্তের Homology এবং Homotophy তত্ত্ব অতি অল্প সংখ্যক মানুষের নিকট প্রয়োজনীয় বস্তু। অর্থাৎ অল্প সংখ্যক মানুষ এই সমস্ত তত্ত্ব পড়িয়ে বা এর সাহায্যে গবেষণা করে বা করিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। অধিকাংশ মানুষ নিরুত্তাপ গাণিতিক তত্ত্বের ব্যাপারে উৎসাহহীন। তবুও অনেকসময় গণিতের কিছু কিছু মৌল তত্ত্ব কবিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Lasswitz Kurd রচিত জার্মান ভাষায় একটি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ তুলে ধরা হোলো।

Fuchs. Your words fill me with an awful dread,
Seems like a circle were squared in my head.

Meph. Next in order you certainly ought
On function theory bestow your thought,
And penetrate with contempletion
What resists your attempts at integration.
You'll find no dearth of theorems there—
To vanishing points give proper care—
Enumerate, reciprocate,
Nor forget to delineate,
Traverse the plane from end to end,
And theta-functions freely spend.[২]

অনেক সময় ছোট ছোট গাণিতিক চিন্তা কবিতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয় এবং এগুলির কাব্যগুণ কোন অংশেই খাটো করে দেখা উচিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্যেটের রচনার একটি ক্ষুদ্র অংশের ইংরাজী অনুবাদ তুলে ধরছি।

---

১. Inangural Lecture, Oxford 1885, Nature, Vol 33, p 228.

২. Der Faust Tragodie (–n) ter Tiel, Zeitschrift fur der math nature unterricht, Bd 14 (1883) p 316.

Would'st thou the infinite essay?
The finite but traverse in every way.
Would'st in the whole delight thy heart?
Learn to discern the whole in its minutest part.[১]

জার্মান সাহিত্যে এ ধরণের আরও অনেক কবিতা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ Albr von Haller যে কবিতাটি লিখেছিলেন সেটির ইংরাজী অনুবাদ তুলে ধরা হোলো—

Numbers upon numbers pile,
Mountains millions high,
Time on time and world on world amass,
Then, if from the dreadful hight, aas !
Dizzy-brained, I turn thee to behold,
All the power of number increased thousandfold,
Not yet may match thy part.
Sublract what I will, wholly whole thou art.[২]

ইংরাজী সাহিত্যেও অনুরূপ কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন John Gower-এর লেখা একটি কবিতার অংশ বিশেষ তুলে ধরছি।

Geometria

Through which a man hath the sleight
Of length, and brede, of depth, of height.[৩]

Lasswitz Kurd বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির উপর (analytical geometry) একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন যা কবিতার ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। তিনি বলেছেন—

১. Gott Gemut und welt (1815).

২. Quoted in Hegel : Wissenschaft der Logik. Buch 1, Abschnitt 2, Kap 2, C, b

৩. Confessio Amantis, BK. 7.

Fuchs. To what study then should I myself apply ?

Meph. Begin with analylical geometry.
There all space is properly trained,
By co-ordinate well restrained,
That no one by some lucky assay
Carry some part of the figure away.
Next thou 'll be taught to realize,
Constructions won't help thee to geometrize,
And the result of a free construction
Requires an equation for proper deduction.
Three-dimensional space relation
Exists for human edification,
That he may see what about him transpires,
And construct such figures as he requires.
Enters the analyst, Forthwith you see
That all this might otherwise be.
Equations, written with pencil or pen,
Must be visible in space, and when
Difficulties in construction arise,
We need only define it otherwise.
For, what is formed after laws arithmetic
Must also yield some delight geometric
Therefore we must not object
That all circles intersect
In the circular points at infinity,
And all parallels, they declare,
If produced must meet somewhere.
So in space, it can't be denied,
Any old curvature may abide.

The formulas are all fine and true,
Then why should they not have a meaning too ?
Pupils everywhere praise their fate
That that now is crooked which once was straight.
Non Euclidean, in fine derision,
Is what it's called by geometrician.

Fuchs I do not fully follow thee.

Meph No better does philosophy.
To master mathematical speculation,
Carefully learn to reduce your education
By an adequate transformation.
Till the formulas are devold of interpretation.[১]

এবার দেখা যাক বিংশ শতাব্দীর মহান গাণিতিক চিন্তাধারাকে আধুনিক সাহিত্যিক বা কবিরা কিভাবে গ্রহণ করেছেন। এই শতাব্দীতে গাণিতিক চিন্তায় যে বিন্যাস, স্বজ্ঞা, সত্তা ইত্যাদির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগে যে অভূতপূর্ব ভাব দেখা যায় আধুনিক সাহিত্যিকরা সে সবকে কিভাবে তাঁদের সেই সাহিত্যকার্য লাগিয়েছেন বা সচরাচর ব্যবহৃত উপমা বা চিত্রকল্পকে কিভাবে প্রভাবিত করেছেন। আধুনিক সাহিত্যিক বা কবিদের রচনায় বিজ্ঞানের নানা রমনীয় তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ এঁদের রচনায় আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত রকেট, এটম বোম্, জীনতত্ত্ব ইত্যাদি থাকছে। হয়তো এঁরা বাল্মিকী বা ব্যাসদেবের মতো স্বাধীনতা পেয়েছেন। বাল্মিকী বা ব্যাসদেব লিখেছিলেন রথের কথা, নানা অস্ত্রের কথা। বর্তমানকালের সাহিত্যিকরা বা কবিরা লিখছেন টেলিভিসন, সিনেমা ইত্যাদির কথা। কিন্তু এঁদের রচনায় গণিতের কোন নূতন তত্ত্ব সংযোজিত হচ্ছে না বা গাণিতিক দর্শনজাত কোন চিন্তা এঁদের রচনায় দেখা যায় না। বলা যেতে পারে—যে যুগে গণিত তুলনামূলকভাবে গৌণ ছিল সেই যুগের কবিতায় গাণিতিক চেতনা বা গণিতের তত্ত্ব বেশ পাওয়া যেতো। অর্থাৎ এই শতাব্দীর কবিতা গাণিতিক

১. Der Faust Tragodie (—n) ter Teil ; Zeitschrift fur der math naturw. Unterricht, Bd 14 (1888), P 316

সচেতনতায় অপেক্ষাকৃত পূর্ব শতাব্দীর তুলনায় ন্যূন। বর্তমান গণিতের যুগ বলেই বোধহয় কবিতার পক্ষে প্রাথমিকভাবে ও সবিস্তারে গণিত অনুবন্ধী হওয়ার প্রয়োজন কমে গিয়েছে। গণিতের প্রসারের ফলে গণিতের লোকরঞ্জক প্রচারও সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে কাব্যে বা সাহিত্যে গাণিতিক চিন্তার অনুপ্রবেশ কমে গিয়েছে। হয়তো একমাত্র দার্শনিক অভিপ্রায় ব্যতীত অন্যরূপে কবিতার মধ্যে গণিতের প্রবেশের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বা আধুনিক কবি বা সাহিত্যিকরা এ ব্যাপারে উদাসীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে এজরা পাউণ্ডের কবিতায় বা লু স্থনের কবিতায় গণিতের উপমা বা চিত্রকল্প প্রভাবিত করেনি। আবার সল বেলোর বা জাঁ পল সাঁত্রের রচনায় কোন গাণিতিক তত্ত্বের অমার্জিত রূপ দেখা যায় না। লক্ষ্য করলেই দেখা যায় পূর্বে সাহিত্যিক বা কবিদের রচনায় সুখ দুঃখের জীবন কথা বেশী থাকতো। মাঝে মধ্যে গণিতের কিছু গূঢ় তত্ত্ব এঁদের রচনায় থাকতো অথবা গণিত নিয়ে কবিতা লেখা হোতো। কিন্তু বর্তমানে বিমূর্ত গাণিতিক তত্ত্ব বা সাধারণ গাণিতিক তত্ত্ব কোনটিরই প্রভাব কবিতায় বা সাহিত্যে দেখা যায় না। হয়তো এর পিছনে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে আগের দিনের গণিত বর্তমানের তুলনায় বেশী সহজ ও সরল ছিল। এমন কি যিনি কবি তিনি সহজেই পূর্ণ বা মূলদ রাশি (integer or rational), নিউটনের তত্ত্বের আদি বিবরণ উপলব্ধি করতে পারতেন। মূলদ রাশির যে ছবি এককালে সারল্যে মনোহরণ করতো সে ছবিকে সাঙ্গীকরণ করতে হয়েছে বর্তমান কালের ডেডিকেণ্ড, ক্যাণ্টরের জটিল যুক্তিজালকে। এমন কি আধুনিক সংহতি তত্ত্বের (Set Theory)সমস্ত জটিল সূত্রকে। বর্তমানে গণিত বিশেষজ্ঞদের অনুশীলনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সাহিত্য সাধকদের কাছে গণিত বোধগম্যতার বাইরে চলে গিয়েছে। হয়তো সেইজন্য সাহিত্যিকদের পক্ষে গণিতকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। একথা সত্য যে টেনিসন বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগের চেয়ে বর্তমান কালের সাহিত্যিক বা কবি অনেক বেশী জানেন তবুও টেনিসন বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ গণিত সম্পর্কে যেটুকু জানতেন বর্তমান সাহিত্যিক বা কবিরা তাঁদের সময়ের গাণিতিক তত্ত্ব বা গণিতিক সম্পর্কে উদাসীন। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় গণিতের অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও এ গণিত কোন চিরায়ত গণিত নয় তবুও তাঁর রচনায় গণিত হয়েছে

রসের বাহন। বর্তমানে আমরা যে দশমিক পদ্ধতির প্রয়োগ করছি রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই মানব জীবনে সেই বিধির বিধান লক্ষ্য করেছেন। 1288 বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসের ভারতী পত্রিকায় 'শূন্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি দশমিকের ব্যবহার উপমার সাহায্যে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন—"এক একজন লোক আছে তাহারা যতক্ষণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে একটা শূন্য (০) মাত্র; কিন্তু একের সহিত যখনি যুক্ত হয় তখনি দশ (১০) হইয়া পড়ে। একটা আশ্রয় পাইলে তাহারা কি না করিতে পারে। সংসারে শত সহস্র শূন্য আছে বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করিয়া থাকে—তাহার একমাত্র কারণ সংসারে আসিয়া তাহারা উপযুক্ত 'এক' পাইল না। কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার মধ্যেই হইল। এই সকল শূন্যদের এক মহা দোষ যে, পরে বসিলে ইহারা ১-কে ১০ করে বটে কিন্তু আগে বসিলে দশমিকের নিয়ম অনুসারে ১-কে তাহার শতাংশে পরিণত করে (.০১) অর্থাৎ ইহারা অন্যের দ্বারা চালিত হইলেই চমৎকার কাজ করে বটে, কিন্তু অন্যকে চালনা করিলে সমস্ত মাটি করে। ইহারা চমৎকার সৈন্য যে মন্দ সেনাপতিকেও জিতাইয়া দেয় কিন্তু এমন খারাপ সেনাপতি যে ভাল সৈন্যদেরও হারাইয়া দেয়। স্ত্রী-মর্যাদা অনভিজ্ঞ গোঁয়ারগণ বলেন, স্ত্রীলোকেরা এই শূন্য। ১-এর সহিত যতক্ষণ তাহারা যুক্ত না হয় ততক্ষণ তাহারা শূন্য। কিন্তু ১-এর সহিত বিধিমতে যুক্ত হইলে সে ১-কে এমন বলীয়ান করিয়া তুলে যে সে দশের কাজ করিতে পারে। কিন্তু এই শূন্যগণ যদি ১-এর পূর্বে চড়িয়া বসেন তবে এই ১-বেচারীকে তাহার শতাংশে পরিণত করেন। স্ত্রৈণ পুরুষদের এক নাম .০১।"

অপূর্ব রচনা। বিশ্ব সাহিত্য বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের মতো অন্য কেউ গণিতকে এভাবে উপমা হিসাবে ব্যবহার করেন নি। গ্যালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে জোনাথন সুইফট গণিতের উপমা দিয়েছেন বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো গণিতের উপমা এত ব্যঙ্গাত্মক ও রসঘন হয়ে ওঠে নি। যদিও জোনাথন সুইফটের রচনায় কতকগুলি উচ্চাঙ্গের বক্ররেখার (curve) কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা সমসাময়িক বা বিংশ শতাব্দীর কোন সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে দেখা যায় না।

টি. এস. এলিয়ট, এজরাপাউণ্ড প্রমুখ কবিদের রচনায় উপযুক্ত বিষয়বস্তুর

মণ্ডল বিস্তৃত হলেও গাণিতিক তত্ত্বের উপমা তাঁদের লেখায় থাকে না। বর্তমানে যে Homotophy, Homology, Fibre bundle প্রভৃতি:আধুনিক গণিতশাস্ত্রের যে বিশেষ দিক আছে তা এঁদের কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে না। বলতে পারা যায় এঁদের রচনায় তথ্য ও তত্ত্ব, গাণিতিক স্বজ্ঞা ও যুক্তি এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত। অবশ্য মাঝে মাঝে কোন কোন কবির লেখায় এ ধরণের দু'একটি কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, আধুনিক কবি ও সাহিত্যিকদের রচনায় সমাজ-সংসক্তির প্রতিক্রিয়ারূপে আত্ম-উন্মোচনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ বিমূর্ত গাণিতিক স্বজ্ঞা বা সত্তার বিপুল সম্প্রসারণের এই যুগে কবিতায় বা সাহিত্যে বিলক্ষণরূপে যে গাণিতি সন্দর্ভ আমরা আশা করতাম সেই গাণিতিক সন্দর্ভ এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অর্থাৎ গণিতকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে কোন কবিতা লেখা বা সাহিত্য রচনা কোনটিই কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য দেশের কবি বা সাহিত্যিকরা করেন নি। স্মৃতির মণি কোঠায় সঞ্চিত যে সব কথা গেঁথে আছে তা থেকে বলা যায় একমাত্র ওমর খৈয়াম ব্যতীত আর কেউ একাধারে গণিতজ্ঞ অন্যধারে কবি ছিলেন না। ওমর খৈয়ামের গণিতচর্চার ক্ষেত্রে কাব্যের ছোঁয়া লেগেছিল। তিনি একজায়গায় বলেছেন—

অস্তি নাস্তি শেষ করেছি দার্শনিকের গভীর জ্ঞান।
বীজগণিতের সূত্ররেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান॥

এই কথাগুলি শুধুমাত্র কাব্যের খাতিরেই বলেন নি। তাঁর জীবনের ধ্যান জ্ঞানই ছিল বীজগণিতের সূত্ররেখাগুলি। বলা বাহুল্য সরাব, সাকী আর রুবাইয়াত ছাড়া ওমর খৈয়ামের কোন অস্তিত্ব কল্পনা করতেও বাধে ; কিন্তু ওমরের জীবনে এগুলির কোন প্রভাব ছিল কিনা এবং থাকলেও তা কতটুকু ছিল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে ঠিক এ ধরণের কবি বা সাহিত্যিক বা গণিতজ্ঞ দেখা যাচ্ছে না যিনি ওমর খৈয়ামের মতো কবিতা এবং গণিত নিয়ে লিখছেন।

সাহিত্যে হাস্যরস আছে এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিশীলিত। গণিতের ক্ষেত্রেও এ ধরণের পরিশীলিত হাস্যরসের জোগান দেখতে পাওয়া

যায়। তবে এই হাস্যরসের মধ্যে অনেক গভীর তত্ত্বীয় গণিতের কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায় যা মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এই পরিশীলিত হাস্যরস যাকে আমরা অনেক সময় গাণিতিক কূট (mathematical paradox) বলে থাকি তা কখনও কখনও প্রখ্যাত গণিতবিদের কলম থেকে আবার কখনও সাহিত্যিকদের কলম থেকে বেরিয়ে আসে। এ ব্যাপারে যাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন ড মরগ্যান। তিনি Budget of Paradox-এ বলেছেন—

A blind man said, As to the Sun,
I'll take my Bible oath there's none ;
For it there had been one too show
They would have shown it long ago.
How came he such a goose to be ?
Did he not know he couldn't see ?
not he

ড মরগ্যানের পুরো নাম হোলো অগষ্টাস ড মরগ্যান। ইনি গণিতবিদ ও গণিত ঐতিহাসিক হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত। এবং এই দুই শাখার উপর প্রচুর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই লেখা সংকলন করে 1872 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্ত্রী Budget of Paradox নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি Philip Quarles নামে এক ভদ্রলোকের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কবিতাটি হচ্ছে—

Or is't a tart idea, to procure
An edge, and keep the practic soul in ure,
Like that dear Chymic dust, or puzzling quadrature ?

আলেকজাণ্ডার পোপ লিখিত "The Dunciad, Bk 4 এ নীচের কবিতাটি দেখা যায়।

Mad Mathesis alone was unconfined,
Too mad for mere material chains to bind,
Now to pure space lifts her ecstatic stare,
Now, running round the circle, finds it square.

কবিতাটির মধ্যে গূঢ়ার্থ বর্তমান, তবে এর কাব্যগুণ কতটা তা বলা কঠিন। কিন্তু কবিতার মাধ্যমে এভাবে কূট (Paradox) তুলে ধরা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়।

বাংলা সাহিত্যেও গণিত নিয়ে পরিশীলিত হাস্যরসের জোগান দেখতে পাওয়া যায়। এই পরিশীলিত হাস্যরসের খোরাক যাঁরা জুগিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজশেখর বসু এবং শিবরাম চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজশেখর বসুর (ছদ্মনাম পরশুরাম) মহেশের মহাযাত্রার গল্পটির সামান্য অংশ তুলে ধরছি। এখানে তিনি গণিতের সাহায্যে ঈশ্বর, ভূত এবং আত্মাকে নস্যাৎ করে ফেলেছেন। তিনি বললেন—

"মহেশবাবু ফুলস্কাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ইশ্বর, আত্মা আর ভূত এই তিনরাশি নিয়ে আত জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ-বিয়োগ, গুণ–ভাগ করে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর=O, আত্মা=ভূত=।/•

বাচস্পতি বললেন, বদ্ধ উন্মাদ

মহেশবাবু বললেন, উন্মাদ বললেই হয় না। এ হলো গিয়ে দস্তর মত ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাস। সাধ্য থাকে তো ভুল বার করুন।" 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পে রাজশেখর বসু ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস নিয়ে কিছুটা হাস্যরস বিতরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"নন্দ। ব্যারামটা কি আন্দাজ করছেন ?

ডাক্তার ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরোবে নাকি ? যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যালকুলাস হয়েছে, কিছু বুঝবে ?

সত্যি বলতে কি গণিত নিয়ে হাস্যরসের উপর এহেন রচনা খুব বেশী একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর দু'চারটি গল্পে গণিত নিয়ে নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে। তার গল্পের নায়ক হর্ষবর্ধণ স্ত্রী ও ছোটভাই গোবর্ধনকে নিয়ে টেনে বেড়াতে চললেন কিন্তু সঙ্গে রয়েছে একটি হাফ টিকিট। গাড়ীতে চেকার উঠতে দেখে হর্ষবর্ধণ তাড়াতাড়ি স্ত্রী ও ভাইকে বেঞ্চের নীচে বসতে বল্লেন এবং নিজে বেঞ্চের উপর পা তুলে বসলেন। চেকার এলে তাঁকে হাফ টিকিট দেখিয়ে একগাল হেসে বললেন—তিনি তাঁর সমস্তটা নিয়ে বেঞ্চের উপরে আছেন, নীচে কিন্তু আরো দুজন আছে। উপরে এক নীচে দুই, মাঝখানে রেখা চিহ্নর মত বেঞ্চটি। অতএব তিনজনে মিলে তাঁরা অর্ধেক।

সতি অঙ্কের সম্বন্ধ বোধের উপর এ ধরণের রম্য রচনা বিরল।

জি. বি. এইরী স্যার উইলিয়ম রোল্যাণ্ড হ্যামিল্টনের সমাধি ফলকের জন্য একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাটিতেও জ্যামিতি শাস্ত্রের অতি সুন্দর একটি তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ ধরণের কবিতা আমাদের নজরে এখন পর্যন্ত খুব কমই পড়েছে। কবিতাটির উদ্ধৃতি তুলে ধরা হোলো।

Here I am as you may see
a^2+b^2-ab
When two triangles on me stand
Square of hypothen is plann'd
But if I stand on them instead,
The squares of both the sides are read.

সুপ্রাচীন কাল থেকে বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের অনুপাত নির্ণয় করার পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে করে আসছে। এই অনুপাতকে π ধরা হয়। এবং এই π এর মান কবিতার মাধ্যমে এবং শব্দ সংখ্যার সাহায্যে খুব কম

দেশই দিতে পেরেছে। A. C. Orr এ সম্পর্কে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

π = ৩·১৪৯, ৫৯২, ৬৫৩, ৫৮৯, ৭৯৩, ২৩৮, ৪৬২, ৬৪৩, ৩৮৩, ২৭৯...

৩ ৪ ১ ৫ ৯
Now I, even I, would celebrate

২ ৬ ৫ ৩ ৫
In rhymes inapt, the great

৮ ৯ ৭ ৯
Immortal Syracusan, rivaled nevermore,

৩ ২ ৩ ৮ ৪
Who In his wondrous lore ৯৬

৬ ২ ৬
Passed on before,

৩ ৩ ৩ ৮ ৩ ৩ ৭ ৯
Left men his guidance how to circles mensurate.

যাইহোক এ ধরণের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠকদের মন বিরূপ করতে চাই না। তবে এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে গণিতে সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে এবং সাহিত্যে গণিতের প্রভাব যথেষ্ট না হলেও কিছুটা রয়েছে। অন্ততপক্ষে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত বিভিন্ন কবিতায় বা সাহিত্যে এ প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কবিতায় বা সাহিত্যে এ প্রভাব খুবই কম। আমরা তাকিয়ে আছি কবে কবির কবিতায় বা সাহিত্যিকের রচনায় বীজগাণিতীক স্থানিকবৃত্তের অন্তর্গত Homology, Homotophy প্রভৃতি শাখার বিভিন্ন তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হবে। হয়তো সেদিন গণিত গবেষকরাও গীতি কবিতার মধ্যে শুধু আনন্দের খোরাক ছাড়াও অন্য কিছুর সন্ধান পাবেন।

1. A· De Morgan, Budget of Paradoxes (London), 1800, p 262.

অষ্টম অধ্যায়
গণিত ও শিল্প

আমাদের দৈনন্দিন জীবন গাণিতিক চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ। কখনও এ চিন্তাধারা সহজ সরল আবার কখনও জটিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় আমরা যে গৃহে বাস করি সে গৃহের প্রতিটি রন্ধ্রে জ্যামিতির ব্যবহার। সুইচ টিপে যখন আলো জ্বালাই তখন কি একবারও মনে পড়ে এর পিছনে গণিতের কত জটিল তত্ত্বের প্রয়োগ রয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, গণিত মানুষের জীবনে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দের অনেকটাই এর উপর নির্ভর করে। হয়তো আমাদের জীবন সঙ্গীত এবং সাহিত্য ব্যাতিরেকে চলতে পারে কিন্তু গণিতবিহীন জীবন অসম্ভব। শুধুমাত্র কতগুলি ধারাবাহিক সূত্র সম্বলিত সংক্ষিপ্ত চিন্তাধারাই গণিতের মুখ্য উপজীব্য বিষয় নয়। এটি সৃজনমূলক চিন্তাধারায় অন্যতম প্রধান যন্ত্রবিশেষ। গণিতের কাজই হচ্ছে মানব এবং প্রকৃতি, অন্তর্বিশ্ব এবং বহির্বিশ্ব ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধিজাত চিন্তাধারা এবং সাধারণ চিন্তাধারার মধ্যে সেতু বন্ধন করা। মানব সভ্যতার অগ্রগতি বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার অগ্রগতির কথাই মনে পড়ে। এগুলি শিক্ষা, সাহিত্য ও প্রকৌশলের মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে গণিতের অবদানই সর্বাগ্রগণ্য। অবশ্য এই আস্রাবন প্রক্রিয়া (osmosis) একমুখী নয় অর্থাৎ উভয়মুখী।

অতীতে গণিতের ব্যবহার পাটীগণিত এবং জ্যামিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু পরে ক্ষেত্র ও আয়তনে গণিতের প্রয়োগ দেখা যায়। তাছাড়াও আর্কিমিদিসের সূত্রে ও লীভারের সূত্রেও গণিতের প্রয়োগ রয়েছে। ত্রিকোণমিতির ক্রমবিকাশের জন্যই নৌবহ-বিজ্ঞানে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। নিউটনের গতিসূত্র, নিউটন ও লাইবনিজের কলনগণিত, নেপিয়ারের লগারিদম প্রভৃতি বিষয় মানব চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। অবশ্য কার্নট ও অ্যাম্পীয়ারের তত্ত্বও এই বিপ্লবকে তরান্বিত করে। প্রথমে পদার্থবিদ্ এবং তারপর বাস্তুকারগণ গাণিতিক সূত্রের প্রয়োগে মনোনিবেশ করেন। ফলে আবিষ্কৃত হয় বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, জাহাজ ইত্যাদি। সবকিছু দেখে মনে

হয় গণিতবিদরাই মানব জাতির উন্নতির নায়ক। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় সমীকরণ বর্তমান বৈদ্যুতিক শিল্পে যুগান্তর এনেছে। কচির (Cuchy) বিশ্লেষণ-মূলক অপেক্ষক (Analytic function) বিমানগতি বিদ্যায় প্রয়োগ করা হয়। বলতে দ্বিধা নেই এই বিশ্লেষণমূলক অপেক্ষক আবিষ্কৃত না হলে হয়তো কোন বিমান আজ আকাশে পাড়ি জমাতে পারতো না। সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক কথা হচ্ছে Laminer flow'তে বিশুদ্ধ গণিতের প্রয়োগ। লেভী সিভিতার কলনবিদ্যাই আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক। আপেক্ষিক তত্ত্বই আবার পরমাণু বিদ্যার জন্ম দেয়। আর এই পরমাণুবিদ্যার জ্ঞান পারমাণবিক বোমা নির্মাণে সাহায্য করে। অবশ্য লেভী-সিভিতা এবং আইনস্টাইনের মত গণিতবিদ্‌রা কখনই তাদের আবিষ্কারের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগের জন্য দায়ী নন। পরমাণু-বিদ্যার সৃজনশীল দিকটিও লক্ষ্যণীয়। পারমাণবিক শক্তি ক্যানসার নিরাময়ে নিযুক্ত, কয়লা থেকে হীরকে রূপান্তরণের কাজে, সমুদ্রে টানেল তৈরীর কাজে ও মহাকাশ গবেষণা প্রভৃতি শত সহস্র জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত। সর্বাধুনিক গাণিতিক তত্ত্ব বলতে গেলে স্পাইনারের তত্ত্ব এবং হিলবার্ট দেশ। অবশ্য এখন আর এটি সর্বাধুনিক নয়। এই তত্ত্বদ্বয় কি প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনবে? আমরা কিন্তু নেতিবাচক উত্তরের চেয়ে ইতিবাচক উত্তরের প্রত্যাশায় রইলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল গণিত পদার্থবিদ্যার জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পদার্থবিদ্যা তার জ্ঞানকে কিভাবে শিল্পে প্রয়োগ করা যায় সে ব্যাপারে রত। কিন্তু এর বিপরীত দৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ অনেক সময় শিল্প গণিতের ক্রমবিকাশে সাহায্য করে। শিল্পে নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের জন্য গণিতের আশ্রয় নিতে হয়। গণিত সেগুলি সমাধান করে আবার অনেকক্ষেত্রে এই সমাধানহেতু নূতন তত্ত্বের জন্ম দেয়। আজকাল অনেক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বহু জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছে। শিল্প এই যন্ত্রের অস্তিত্বে লাভবান হচ্ছে। ফ্রান্সের গণিতজ্ঞ পেরে এবং মালভার্ট ইলেক্ট্রোলিটিক ট্যাঙ্ক তৈরী করেছিলেন যেখানে আকার রেখাস্থ (Contour) কোন প্রদত্ত মানে বিপরীত অপেক্ষকের (Harmonic function) সমস্যা সমাধান করা হয়ে থাকে। ছয় বা তৎনিম্ন মাত্রার কতগুলি রৈখিক অবকল সমীকরণ সমাধানের জন্য একটি জটিল যন্ত্র নির্মিত হয়েছে। আমেরিকাতে এমন স্লাইডরুল বহু পূর্বে নির্মিত হয়েছিল যার সাহায্যে জটিল চলরাশির বিভিন্ন

প্রক্রিয়ার সমাধান করা যায়। এমন যন্ত্রও আছে যার সাহায্যে একটি অপেক্ষককে ফোরিয়ায় শ্রেণীতে প্রকাশ করা যায় এবং পর পর পদগুলিও গণনা করা যায়। লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব গাণিতিক রোবটের সাহায্যে শিল্প অনেক গাণিতিক সমস্যার সমাধান করছে। গাণিতিক চিন্তাধারা অনেক ভৌতসূত্রের আবিষ্কারক, আবার অনেক ভৌতসূত্র গাণিতিক চিন্তাধারার সূতিকাগৃহ। যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের এই ক্রমবিকাশকে স্তব্ধ না করে তাহলে প্রকৌশলী ব্যবস্থা আমাদের জীবনযাত্রায় মান এবং সুখ স্বাচ্ছন্দকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের বিশ্বাস, শিল্পের দুর্বলতম দিক হচ্ছে—শিল্পজাত সমস্যায় গাণিতিক চিন্তাধারার প্রয়োগ না হওয়া। কারণ হিসাবে বলা যায় শিল্পপত্তনকারীরা তাৎক্ষণিক লাভ চান এবং সেইমত লোক নিয়োগ করেন। গণিতবিদ নিয়োগ প্রসঙ্গে তাঁরা উদাসীন। অনেক শিল্পপতি গুণী শ্রমিকের পরিবর্তে সাধারণ শ্রমিক নিয়োগ করেন। অর্থাৎ তাঁদের পছন্দের নমুনা এইরকম—একজন গণিতবিদের চেয়ে একজন পদার্থবিদকে পছন্দ করেন, একজন পদার্থবিদের চেয়ে একজন বাস্তুকারকে পছন্দ করেন, একজন বাস্তুকারের চেয়ে একজন ফোরম্যানকে পছন্দ করেন। বেতনের প্রশ্ন উঠলে দেখা যায় একজন বাস্তুকার একজন ফোরম্যানের চেয়ে বেতন বেশী পান এবং একজন গণিতবিদ একজন পদার্থবিদের চেয়ে কম বেতন পান। অর্থনৈতিক কাঠামোয় এই ব্যবস্থার জন্য বিশুদ্ধ গবেষণা অনেকক্ষেত্রে ব্যাহত হচ্ছে। গবেষকদের একদলকে এমনভাবে গবেষণা করতে হবে যার ফল শিল্পে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই গবেষকদল কখনও গণিতে নূতন তত্ত্বের সন্ধানে রত হবেন না। তাদের কাজই হবে গাণিতিক তত্ত্বের সংগে পরিচয় লাভ এবং শিল্পে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় তারই সুষ্ঠু সমাধান করা। এই নূতন গবেষকদলকে শিল্পজ্ঞ গণিতবিদ বলা হবে। হয়তো দেখা যাবে এঁরাই বিশুদ্ধ গণিত গবেষণার এবং দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে একটি সেতু রচনা করছেন। এ যদি সম্ভব হয় তাহলে মানব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ সবকিছু আরো উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। পাশ্চাত্য জগৎ এ ভাবধারায় কিছুটা অনুপ্রাণিত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পপতিরা এ ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, আশা করবো ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে কিছুটা দৃষ্টি দেবেন। নিয়ম করা হোক প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

ফলস্বরূপ আমরা দেখবো অনেক সমস্যার ত্বরিত সমাধান হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের কর্তৃপক্ষ এমনভাবে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা শিল্প তথা সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতে পারে। আমরা কি এটুকু প্রত্যাশা করতে পারি না ভবিষ্যৎ গণিত গবেষণা এবং ভবিষ্যৎ শিল্প একই সূত্রে গাঁথা থাকবে।

নবম অধ্যায়
গাণিতিক চিন্তার মনস্তত্ত্ব

মানুষ যেসব চিন্তা করে তার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ কি? এবং কিভাবে এই চিন্তা মানব জীবনকে সুন্দর করতে সাহায্য করে? বলাবাহুল্য, যেসব শাস্ত্র পরোক্ষভাবে সাহায্য করে তাদের সম্বন্ধে এই কথা বলাই শ্রেয় যে কেবল বেঁচে থাকাই মানুষের উদ্দেশ্য নয় বরং মহৎ বস্তু সম্বন্ধে চিন্তার মাধ্যমে জীবন-যাপন প্রণালী অধিকতর কাম্য। কিন্তু বর্তমানে গণিতশাস্ত্রকে মানুষেরা এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে সভ্যতার ক্ষেত্রে যোগ্য মর্যাদা লাভের বিষয়ে গণিতশাস্ত্র ভুলের বোঝা বহন করে চলেছে। কারণ গণিতশাস্ত্র অযথা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন এবং তুচ্ছতার একটি বিরাট জঞ্জাল স্তূপের নীচে চাপা পড়েছে। বলাবাহুল্য গণিতশাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হোলো বিচারশক্তির প্রশিক্ষণ করা। যে সত্য প্রমাণিত হোলো তার উপর ছাত্রদের নির্ভরশীলতা এবং প্রমাণের প্রতি মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। যদি কোন ছাত্র বা শিক্ষক মশাইকে প্রশ্ন করা যায় যে যথার্থ গণিতশাস্ত্র বলতে কি বোঝেন? তাঁরা প্রশ্নটি হয় এড়িয়ে যাবেন না হয় একটি উদ্ভট উত্তর দেবেন যাতে এঁদের প্রতি আস্থার অভাব দেখা দেবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল এনিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন "যথার্থ গণিতশাস্ত্র আমরা অনুমানের (inference) কোন একটি নিয়ম দ্বারাই আরম্ভ করি এবং উহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে—যদি এইরূপ একটি বাক্য সত্য হয় তাহা হইলে এইরূপ অন্য একটি বাক্যও সত্য হইবে।" রাসেল অন্যত্র বলেছেন "ইহা এমন একটি বিষয় যাহাতে আমরা কি সম্বন্ধে বলিতেছি—তাহা সত্য কিনা জানি না।" বলাবাহুল্য প্রকৃত গণিতশাস্ত্র যে কি এই তত্ত্ব আবিষ্কার করাই আধুনিক গণিতশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। তবে গণিত কি তার চেয়ে বড় কথা গাণিতিক চিন্তার মনস্তত্ত্ব কি তা জানাই আবশ্যক।

গণিতের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই আমরা বলতে পারি যে কোন লোক একাধারে মনস্তত্ত্ববিদ এবং অন্যধারে গণিতবিদ হতে পারেন না। ফলে এ দিকটা চিন্তা করার মত বা মনঃসংযোগ করার মতো লোক খুবই কম দেখা যায়।

আমরা জানি মনস্তত্ত্বের দুটি পদ্ধতি আছে। একটি অন্তর্মুখী (subjective) দ্বিতীয়টি বৈষয়িক (objective)। অন্তর্মুখী বলতে আমরা বুঝি যে চিন্তা ভিতর থেকে উত্থিত অর্থাৎ চিন্তাকারী তাঁর নিজস্ব মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে চিন্তা করে থাকেন। এ ধরণের চিন্তার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হলে এই অন্তর্মুখী চিন্তা ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ সহ চিন্তা করা যায় তাহলে হয়তো আমাদের গাণিতিক চিন্তার কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে। বৈষয়িক পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝবো বহির্জগতে যা দেখছি তা নিয়ে চিন্তা করে কিছুটা অগ্রসর হওয়া।

একথা ঠিক যে গণিত চর্চাকারীকে অবশ্যই গণিতের দিকে ঝোঁক থাকতে হবে। ব্যাপ্তীকৃত যে সৃজন এবং ব্যাপ্তিকৃত যে বুদ্ধিসত্তা তারই একটি অংশ হচ্ছে গাণিতিক সৃজন এবং গাণিতিক বুদ্ধিসত্তা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ছাত্র গণিতে প্রথম হচ্ছে সে অন্যান্য বিষয়েও ভালভাবে সাফল্যলাভ করছে। অবশ্য রামানুজনসহ কয়েকজনের দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় নাম করা গণিতবিদ অন্যান্য বিষয়ে যেমন পদার্থবিদ্যা রসায়ন ইত্যাদি শাস্ত্রেও গবেষণা করে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গাউস, নিউটন প্রমুখ গণিতবিদরে নাম করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য ভাষা যেমন কয়েকটি চিন্তার সংমিশ্রণ ঠিক অনুরূপভাবে বলা যায় গাণিতিক চিন্তাও কয়েকটি চিন্তার সংমিশ্রণ।

গাণিতিক সৃজন সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদদের মধ্যে দুটি দল আছে। একদল যাঁদের নেতা সউরিয়ঁ (sourian) মনে করেন গাণিতিক সৃজন সম্পূর্ণভাবে চান্সের উপর নির্ভরশীল। অন্যদল যাঁদের নেতা পলহাঁ (paulhan) মনে করেন যে গাণিতিক সৃজন হেতু এবং পদ্ধতিগতভাবে ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। গণিতবিদেরা এ ব্যাপারে অবশ্য অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে দুটি দল আছে। একদল যাঁদের নেতা হচ্ছেন ম্যালেট—যিনি মনে করেন গণিত গবেষণার ক্ষেত্রে গাণিতিক স্বপ্নের কথা ধরতে হবে। অর্থাৎ অনেক গাণিতিক চিন্তা মাঝপথে হয়তো স্তব্ধ হয়ে গেল কিন্তু দেখা যাবে স্বপ্নের মধ্যে সেটি সমাধান করা গেল। অবশ্য এই মত খুবই জোরালো তা কিন্তু নয়। মাত্র দু/চারটি ক্ষেত্র ছাড়া এ মতধারার পক্ষে খুব বেশী দৃষ্টান্ত দেখানো সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে প্রখ্যাত গাণিতিক এল. ই. ডিকসনের কথা ধরা যেতে

পারে। এঁর মা এবং বোন দুজনেই অঙ্কের শিক্ষয়িত্রী এবং মা ও মেয়ের মধ্যে অলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কোন একদিন এঁরা উভয়েই কোন একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধানে বিফল হন। কিন্তু একদিন ডিকসনের মা ঘুমের মধ্যে ঐ গাণিতিক প্রশ্নটির সমাধান করে ফেলেন এবং ঘুমের মধ্যেই ঐ সমাধানটি তিনি বলতে থাকেন। মেয়ে কিন্তু শুনেই তা লিখতে শুরু করেন এবং সেটি পরদিন সমাধান আকারে প্রচার করতে থাকেন। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে অবচেতন মনে যদি কোন গাণিতিক প্রশ্ন সমাধানহীন অবস্থায় থাকে তাহলে অনেক সময় ঘুমের ঘোরে তা সমাধান করা যায়। ঠিক অনুরূপ পরীক্ষা একজন অজ্ঞাতনামা গণিতবিদের ক্ষেত্রে করা হয়। আবার দেখা যায় অনেক সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে কোন গাণিতিক তত্ত্বের সমাধান করা গেল অথচ সমাধানটি বেশ কয়েকদিন ধরে হচ্ছিল না।

লক্ষ্য করার ব্যাপার যে গাণিতিক চিন্তা যখন করা হয় তখন বাহিরের গণ্ডগোল বা আবহাওয়া অথবা সাহিত্য ও শিল্প সেই সময় মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় কোন গাণিতিক চিন্তা একঘেয়ে মনে হলে তখনকার মতো বিরতি ঘটিয়ে আবার চিন্তা করা যায় কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে। যখনই কোন গণিতবিদকে বলা হয় তাঁর গাণিতিক চিন্তার সময় বা কিছুটা বিরতির পর সাহিত্য বা শিল্পকলা তাঁর মনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে? তিনি হয়তো এর সঠিক উত্তর দিতে পারেন না। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণিত ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় হয়তো মনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন হয়েছিল বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হারমিটের ক্ষেত্রে। হয়তো কখনও কখনও গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মনের উচ্ছাস বা বিমর্ষভাব প্রভাব বিস্তার করে এবং সেটিও লক্ষণীয়। গণিতবিদরা যখন কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ বা ব্যর্থ হন তখন তাঁদের মনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় তা লক্ষণীয় এবং এটি নোট করা প্রয়োজন। অনেক সময় এটি করলে তাঁদের গাণিতিক চিন্তায় যে ত্রুটী আছে তা দূরীভূত হতে পারে। তবে হয়তো কোন প্রতিষ্ঠিত গণিতবিদ এ ব্যবস্থা করতে অসম্মত হবেন কিছুটা লজ্জায়।

যখন কোন গাণিতিক চিন্তা করা হয় তখন পূর্বে আবিষ্কৃত তথ্য মনের মাঝে সর্বদাই আলোড়িত হয় তা লক্ষ্য করতে হবে। অথবা অনেকে হয়তো পূর্বের তথ্যের প্রতি ততটা পরিচিত না হয়েও কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার

করলেন। এতে হয়তো দেখা যাবে যে ইতিমধ্যেই তাঁর তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁর শ্রম বিফলে গেল এবং বৃথা সময় নষ্ট হোলো।

অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কোন গাণিতিক চিন্তা হয়তো বহুক্ষণ ধরে করা হচ্ছে কিন্তু কোনরকম সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। তখন অন্য কোন চিন্তা বা কাজে মনোনিবেশ করলে এবং অবচেতন মনে ঐ গাণিতিক চিন্তা করলে হয়তো কোন সুষম গাণিতিক চিন্তার উদয় হতে পারে যা একটি নূতন তত্ত্ব হিসাবে আমাদের সম্মুখে হাজির হবে। গণিত গবেষণার সময় টুকরো টুকরো গাণিতিক চিন্তার সমাবেশ ঘটে। সেই সময় যদি লিখে রাখা যায় এবং পরে সেগুলি সমন্বয় ঘটানো যায় তাহলে হয়তো কোন তথ্য আমরা পেতে পারি। একথা ঠিক যে কোন লোকের মধ্যে সৃজনী অনুপ্রেরণা না থাকলে গাণিতিক চিন্তায় কোন নূতনত্ব আসতে পারে না। মনের মধ্যে হঠাৎ কোন গাণিতিক চিন্তার সঠিক ঝলকানি যখন আসে তখন তা সর্বদাই চান্স হিসাবে ভাববার কারণ নেই। সন্দেহ নেই যে যাঁর মধ্যে এধরণের চিন্তা আসে তাঁর অগো-চরেই হয়তো কোন মানসিক পদ্ধতির সাহায্যে পূর্বের কোন চিন্তাধারার সঙ্গে সর্বদাই সংযোগ রক্ষিত হয়ে থাকে।

গাণিতিক তত্ত্বের আবিষ্কার যে হঠাৎ কোন ঘটনামাত্র নয় একথা অধিকাংশ গণিতবিদই মনে করেন। হয়তো বলা যেতে পারে যে হঠাৎ ঘটনার কিছু কিছু ইঙ্গিত এই গাণিতিক তত্ত্বের আবিষ্কারে প্রভাব বিস্তার করে তবে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল একথা কোন মতেই বলা যায় না। একথা সত্য যে আবিষ্কার বা সৃষ্টি যাই হোক না কেন উভয়ক্ষেত্রে চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য বহু ক্ষেত্রে এই সমন্বয় সাফল্যলাভ করে না। তবে যত প্রকার সম্ভব চিন্তাসমূহের সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন এবং হয়তো এ থেকেই নূতন কোন তত্ত্বের বীজ পাওয়া যেতে পারে। যে মানসিক পদ্ধতিতে এ ধরণের চিন্তাধারার সমন্বয়ের প্রশ্ন জড়িত থাকে সেখানে চান্সের একটি ভূমিকা থাকতেও পারে তবে তা মুখ্য নয়।

কোন গাণিতিক তত্ত্ব সৃষ্টি করতে গেলে চিন্তাসমূহের সমন্বয় করা প্রাথমিক কাজ এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও মনোনয়ন অন্যতম অঙ্গ বলে মনে করা উচিত। বলা বাহুল্য যাঁরা গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারে পারদর্শী তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে সঠিক মনোনয়ন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

এই যে মনোনয়ন তাঁকে অনুভবের মাধ্যমে জানতে হয়। কখনই এটিকে সূত্রায়িত করা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চিন্তার কোন প্রশ্ন নেই। আবেগের একটি স্থান গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সৌন্দর্য আনয়ন করে।

গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মানসিক বিশ্রাম ও মানসিক স্থিরতা অন্যতম অপরিহার্য সর্ত। সঠিক গাণিতিক চিন্তা কখনই অস্থিরতা বা অশান্তিতে আসতে পারে না। ফলে গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে গেলে সুস্থ চিন্তাধারা অপরিহার্য। সৃজনশীল গাণিতিক চিন্তা অধিকাংশই হঠাৎ আসে এবং অধিকাংশই মানসিক শ্রান্তির পর যখন সতেজ মন থাকে সেই সময় আসে। প্রতিভাশালী গণিতবিদদের মধ্যে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রবল। চাঙ্গ চেতন মনের অন্যতম কার্যকারিতা হিসাবে ধরা যেতে পারে। যাঁরা ভাল গণিতবিদ তাঁদের মধ্যে চিন্তাসূত্র খুবই কম অস্পষ্ট থাকে। আর যেটুকু থাকে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে নেওয়া হয়। কিন্তু যদি গাণিতিক চিন্তাকে মাঝে মাঝে দূরে সরিয়ে রাখা হয় তাহলে গাণিতিক সৃজনীর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসতে বাধ্য। অধিকাংশ ভারতীয় গণিতবিদদের মধ্যে গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে লাফিয়ে চলার প্রবণতাই বেশী।

যখন কোন গাণিতবিদ কোন গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন এবং অনতিবিলম্বে শুনলেন তাঁর এই তত্ত্বের কিছুটা অন্য কোন গণিতবিদ আংশিক-ভাবে আবিষ্কার করেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেননি তখন প্রথমোক্ত গণিতবিদের উচিত পরের গণিতবিদের কাজের কিছুটা স্বীকৃতি দান করা নতুবা গবেষণা ব্যাহত হতে পারে। একথা ঠিক যাঁদের গাণিতিক চিন্তায় ব্যর্থতা দেখা যায় তাঁরা তাঁদের কাজকে ফেলে না দিয়ে রেকর্ড রেখে দিলে ভাল হয়। পরে এ নিয়ে চিন্তা করলে হয়তো কোন গাণিতিক তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে হাজির হতে পারে। যে সমস্ত গাণিতিক তত্ত্ব আমাদের চিন্তায় আসছে তা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করা উচিত। নতুবা অন্যে সেই তত্ত্বটি আবিষ্কার করতে পারে। যখন কোন গণিতবিদ তাঁর সূত্রে চিহ্নাদি এবং তাঁর ধারণা প্রবর্তন করেন তখন তিনি কি করতে চলেছেন তা কি তিনি জানেন? যখন এগুলি করেন তিনি কি প্রতিটি ধাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন? সম্ভবতঃ

সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম তিনি করতে পারেন নি। অনেক সময় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিশ্চয়ই ব্যাহত হয়েছিল।

যদি কোন জটিল গাণিতিক তত্ত্ব কখনও কোন গবেষণামূলক পত্রিকায় দেখা যায় তাহলে একবারেই যে সেটি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে তার কোন মানে নেই। যখনই এই নূতন তত্ত্বটি উপলব্ধি করা যায় সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে এ থেকে আর কি তত্ত্ব বা তথ্য আমরা পেতে পারি। এই যে গাণিতিক চিন্তা আমরা করে থাকি তা কি শব্দ সমষ্টি? এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিধা রয়েছে। একদল ভাবেন যে কোন গাণিতিক চিন্তা শব্দের সংকলন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অন্যদল এ মতের বিরোধী।

মনস্তত্ত্ববিদেরা দুধরণের চিন্তার কথা বলে থাকেন—এক মুক্ত চিন্তা অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যে চিন্তা অগ্রসর হয় না। দ্বিতীয় চিন্তাটি নিয়ন্ত্রিত। আমাদের চিন্তার মধ্যে অধিকাংশ নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারার প্রভাবই বেশী। কিন্তু সৃজনশীল চিন্তার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম ও কিছুটা পার্থক্যযুক্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়। এটি করতে গেলে একাগ্রতার প্রশ্ন জড়িত কিন্তু তার অর্থ এটি নিয়ন্ত্রিত তা কিন্তু নয়।

নূতন কোন তত্ত্ব বা তথ্য উদ্ভাবন করতে গেলে যে কথা প্রথমেই মনে আসে তা হচ্ছে আমরা কি আবিষ্কারে সচেষ্ট হচ্ছি বা কি ধরণের গাণিতিক সমস্যা সমাধানে তৎপর হচ্ছি। গাণিতিক তত্ত্ব উদ্ভাবনে দুটি ধারা আছে। (এক) নির্দিষ্ট গাণিতিক তত্ত্বের লক্ষ্য প্রদত্ত, আমাদের দেখাতে হবে কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবো। সুতরাং গাণিতিক চিন্তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন যাতে সে লক্ষ্য থেকে পদ্ধতির দিকে ধাবিত হবে। অর্থাৎ প্রশ্ন থেকে সমাধানে উত্তরণ ঘটবে। (দুই) অন্য ধারাটি হচ্ছে এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ কোন গাণিতিক চিন্তার ঘটনা আবিষ্কার করা গেল এবং এটাকে কিভাবে সুপ্রযুক্ত ও সুবিন্যস্ত হবে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে পদ্ধতি থেকে লক্ষ্যে উত্তরণ ঘটছে। এখানে প্রশ্নের পূর্বে উত্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছে।

বলা বাহুল্য অনেকেই মনে করেন দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আরও বেশী সামান্যীকরণ (generalisation)। অনেকের ধারণা সমগ্র সভ্যতা এই পদ্ধতির উপর চালিত। যখন গ্রীকেরা চার'শ খ্রীষ্টপূর্বে উপবৃত্ত আবিষ্কার করেছিল এবং কতকগুলি বৈশিষ্ট্য

লক্ষ্য করেছিল তখন কিন্তু এর প্রায়োগিক দিকটা নিয়ে চিন্তা করা হয় নি। যাই হোক এ ব্যাপারটি নিয়ে যদি তারা চিন্তা না করতো তাহলে হয়তো কেপলারের পক্ষে গ্রহ সম্পর্কে যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভব হোতো না। বস্তুত অনেক আবিষ্কার আছে যা অন্বেষণের মাধ্যমে করা যায় এবং ব্যাখ্যাত্মক কিন্তু এর প্রায়োগিক দিকটা ততটা সব সময় পাওয়া যায় না।

কিন্তু এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায় প্রায়োগিক দিকটাও বিশেষ কার্যকরী। হয়তো এটি নূতন কোন সম্ভাব্য দিকে ইঙ্গিত দিতে পারে। অনেকে মনে করেন বৃক্ষের যেমন পত্রের সঙ্গে সম্পর্ক তেমনি গাণিতিক তত্ত্বের সঙ্গে এর প্রয়োগ সংযুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় জ্যামিতি শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার জন্যই এর উদ্ভব। গাণিতিক চিন্তার প্রায়োগিক দিকটার প্রসঙ্গ আলোচনা থেকে বিরত থেকে বলা যায় গণিতের উপর গবেষণার অর্থই তাত্ত্বিক দিকটা প্রয়োজনীয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা গাণিতিক গবেষণার বিষয়বস্তু কিভাবে পছন্দ করবো? এটি একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। এটি গণিতজ্ঞদের বিচার ও বুদ্ধির পরিশীলিত চিন্তার উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় ছাত্ররা গবেষণার বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্পর্কে তত্ত্বাবধান চান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলে দেওয়া হলেও এ ধরণের চিন্তাধারাকে সমর্থন করা যায় না। এতে ছাত্রদের ক্ষতিই হয়। কারণ ছাত্ররা দু/তিন বছর নিয়মিত ক্লাশ করেছে তা থেকে কি তাঁরা বুঝতে পারেন না যে এর মধ্যেও এমন অনেক কিছু আছে যা গাণিতিক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন আমরা যারা বহিরাগত (external) স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পড়াই, লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এরা গবেষণার দিকে খুব বেশী ঝোঁকে না। তাছাড়া কি নিয়মিত ছাত্র কি বহিরাগত ছাত্র কাউকেই এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না যাতে তার মনে গাণিতিক চিন্তার বিকাশ ঘটে। আমাদের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্যসূচী এ ব্যাপারে খুব সাহায্য করে বলে মনে হয় না। যদিও অনেক সময় এ ধরণের জিজ্ঞাসু মনোভাব সৃষ্টি করা সম্ভব কিন্তু ছাত্ররা এক্ষেত্রে একাত্মবোধ করে না। তাঁরা চান নোটস, সাজেসানস্ অথবা কি করে ভাল রেজাণ্ট করবো বা পাশ করবো। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার একটি ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার এক ছাত্রী এম. এস. সি প্রাইভেটে পড়বার জন্য এলো। তাকে

এ ধরণের অনুসন্ধিৎসু মন করার চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে ভাবলো এতে তার কি লাভ হবে। আমার কাছে পড়া শেষ হবার পূর্বেই সে বললো—আপনি পাঠ্যসূচী বহির্ভূত জিনিস পড়িয়েছেন। আপনি আমার ক্ষতি করেছেন। সত্য কথা বলতে কি এরপর আমি দু/একটা ছাত্র ছাড়া আর কাউকে এভাবে পড়াই নি। এতে ছাত্রদের ক্ষতি হয়েছে। যাই হোক আমরা যে পূর্বে মনোনয়নের কথা বলেছিলাম তা কি ভাবে হবে সে দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, মনে হয় এর একটি গাণিতিক সৌন্দর্য নিশ্চয়ই থাকবে যা তাকে মুগ্ধ করবে এবং গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তবে একটা কথা জানা দরকার যে গাণিতিক গবেষণার ক্ষেত্রে গভীর ও অবিচ্ছিন্ন মনসংযোগ, চিন্তার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা প্রয়োজন।

মানুষের চিন্তায় সাধারণজ্ঞান যেমন অপরিহার্য তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিও থাকা প্রয়োজন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি করে মূলকথার সারাংশ থাকবে, কিভাবে এর ব্যবহার থাকবে এবং এই চিন্তা করতে গেলে প্রাথমিকভাবে কি কি প্রয়োজন তা জানা দরকার। যাঁরা গাণিতিক চিন্তার সঙ্গে জড়িত তাঁদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। একথা ঠিক যিনি বীজগণিতিক স্থানিকবৃত্ত (algebraic Topology) এবং যিনি জ্যামিতির উপর গবেষণা করছেন তাঁদের চিন্তার স্রোত ও পদ্ধতি এক, শুধু চিন্তার বিকাশ যে পথে অগ্রসর হবে সেই পথ হয়তো ভিন্ন। হয়তো যাঁরা ব্যর্থ হন তাঁরা যে চিন্তা করেন তারই মধ্যে কোন ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। যখন কোন গবেষণামূলক পত্রিকায় কোন নূতন তত্ত্ব কোন গবেষক পাঠ করেন তখন তাঁর উচিত এর প্রত্যেকটি ধাপ যুক্তির সঙ্গে বিবেচনা করা। এই যুক্তির যৌক্তিকতা পুংখানুপুংখভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা এবং সময় সময় এর প্রয়োগের দিকটাও ভাবা দরকার। তারপর বলা যেতে পারে হ্যাঁ তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করেছি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চিন্তাধারাটি গবেষকদের মধ্যে অনুপস্থিত। এঁরা ধরেই থাকেন যে যুক্তি এখানে দেখানো হয়েছে তা অনড় এবং এক বা একাধিক যেসব যোগাযোগ বা সমন্বয় ঘটানো হয়েছে তার বাইরে কি থাকতে পারে তাও চিন্তা করা উচিত। বলাবাহুল্য এ সম্পর্কে যে চিন্তার সূত্র আছে তাও তাঁরা মানতে রাজি নন। এঁদের চিন্তার ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা দেখা যায় তাতে ধারণা হয় এঁদের চিন্তায় কিছুটা ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়

ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ করে বাঙ্গালীদের মধ্যে গণিত গবেষণায় যে মানসিকতা গড়ে উঠছে না তার কারণ গণিতশিক্ষা যেভাবে দেওয়া উচিত বিশেষকরে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে তা ত্রুটিপূর্ণ। পড়াশুনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে-যে যুক্তি তাঁদের দেখানো হচ্ছে তা তাঁরা সচেতনভাবে গ্রহণ করছেন কিনা। তাঁদের সামনে যে যুক্তির জাল বিস্তার করা হচ্ছে তা ব্যাখ্যাত্মক ও যথাযথ কিনা এবং কেন যথাযথ সে সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। যাই হোক গণিত সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হওয়া বা গণিত শাখায় গবেষণা করতে গেলেই জ্যাঁ হদমার্দ রচিত নিম্নলিখিত অংশটুকু জানা উচিত।

(ক) কোন সময়ে এবং কি পরিস্থিতিতে গণিতের প্রতি আগ্রহান্বিত হলেন। গণিতের প্রতি এই যে আগ্রহ তা কি বংশগত? পূর্বসূরী বা পরিবারের ভাই, বোন, কাকা, মামা প্রমুখ আত্মীয় স্বজন গণিতের প্রতি আগ্রহী থাকার জন্যই কি আপনার গণিতের প্রতি এই আগ্রহ। তাঁদের প্রভাব বা দৃষ্টান্তই আপনাকে গণিতের প্রতি আগ্রহান্বিত করেছে কি?

(খ) গণিতের কোন শাখার প্রতি আপনার আগ্রহ।

(গ) গণিতের তাত্ত্বিক দিকে আপনার আগ্রহ নাকি এর প্রয়োগের প্রতি আপনার আগ্রহ।

(ঘ) যখন ব্যক্তিগত গবেষণার চেয়ে অন্যান্য ফলগুলির সমন্বয় করে লক্ষ্যে পৌছান দরকার তখন কি করে স্বচিন্তাধারায় চালিত হওয়া যায় তা ভাবেন কি?

(ঙ) গণিতে নিয়মিত পাঠ নেবার পর কিভাবে আপনি আগ্রহান্বিত হতে চান। গণিতের অধিকাংশ শাখা পড়তে চান নাকি কোন একটি বিশেষ শাখা গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে চান। হয়তো এমনও হতে পারে গণিতের বিভিন্ন শাখায় বেশ কিছুটা জ্ঞান হবার পর, তারপর ধীরে ধীরে গভীরে প্রবেশ করতে চান। এছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে আপনি যদি পড়াশুনা করে থাকেন তাহলে সংক্ষেপে আপনি আপনার বক্তব্য তুলে ধরুন।

(চ) যে সমস্ত সত্য আপনি উদ্ঘাটন করেছেন সেগুলির মধ্যে যেগুলি অতিশয় মূল্যবান তা কি নির্ণয় করেছেন?

(ছ) যে সমস্ত গাণিতিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন সেক্ষেত্রে দৈব অথবা অনুপ্রেরণার ভূমিকা কতটুকু। এদের ভূমিকা কি আপনার গবেষণার সময় বড় করে দেখা যায়?

(জ) আপনি লক্ষ্য করেছেন কি যখন আপনি গাণিতিক চিন্তার সূত্র সন্ধান করেন তা অনেকক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বহিরাগত। হয়তো পূর্বে আপনি যেসব গাণিতিক চিন্তা করে বিফল হয়েছেন তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

(ঝ) আপনি যখন অর্ধজাগরিত অবস্থায় থাকেন অথবা স্বপ্নের মধ্যে আপনার গবেষণার সূত্রগুলি সমাধান দেখতে পান কি? অথবা সকালে ঘুম থেকে উঠেই গতরাত্রে বা দু/একদিন পূর্বে যে ব্যর্থ চিন্তার সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন সেই সমস্যার হঠাৎ সমাধান আপনার মনে এসেছিল কি?

(ঞ) গভীরভাবে চিন্তার উদ্যম নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার ফলস্বরূপ আপনার মুখ্য আবিষ্কার সম্পন্ন হয়েছে নাকি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার মনে এটি এসেছে।

(ট) গবেষণা করার সময় কোন একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এসে পৌছানোর এটিকে প্রকাশ করার জন্য আপনি এটিকে সম্পূর্ণ লিখে ফেলেন নাকি যে সিদ্ধান্তগুলি পেয়েছেন সেগুলি জড়ো করে নোট আকারে লিখে ফেলেন এবং তারপর সম্পাদনা করে থাকেন।

(ঠ) আপনি যখন প্রকাশিত গবেষণা পত্র পড়েন তখন এর প্রতি কতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এবং নবীন গণিতজ্ঞকে যার গাণিতিক চিন্তা কিছুটা পরিপক্ক তাঁকে কি উপদেশ দেন।

(ড) যখন কোন গাণিতিক গবেষণা শুরু করতে প্রস্তুত হন তখন কি পূর্বে এ সম্পর্কে যা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি সংগ্রহ করে মন দিয়ে উপলব্ধি করেন?

(ঢ) কোন রকম ধরা বাঁধা গাণিতিক চিন্তা না করেও আপনি মুক্তমনে আপনার চিন্তাধারাকে সম্প্রসারিত করেন তারপর লিখে ফেলার পর ভাবতে থাকেন এ সম্পর্কে আগে কেউ ভেবেছে কি না।

(ণ) যখন আপনার কাছে কোন গাণিতিক উদাহরণ বা প্রশ্ন সমাধানের জন্য আসে তখন কি আপনি এটিকে সাধারণীকৃত (general) হিসাবে দেখেন না কি নির্দিষ্ট প্রশ্ন হিসাবে দেখেন।

(ত) যখন কোন গাণিতিক পদ্ধতি চিন্তা করেন তখন কি আপনি আবিষ্কার এবং সম্পাদনার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন?

(থ) গবেষণা করার পূর্বে আপনি যেভাবে পড়াশুনা করতেন ঠিক সেই অভ্যাসমতই কি গবেষণার সময় পড়াশুনা করে থাকেন ?

(দ) গবেষণার জন্য যে পড়াশুনা করে থাকেন তা কি একইভাবে কোন রকম বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে ক্রমশঃ একাগ্রচিত্তে আপনার চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান নাকি মাঝে মাঝে আপনার চিন্তাধারাকে স্থগিত রেখে আবার চিন্তা করতে থাকেন।

(ধ) গণিতের জন্য প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে বা বৎসরে কতটা সময় ব্যয় করেন এবং বাকী সময় কি কাজে ব্যয় করেন।

(ন) কোন শৈল্পিক চিন্তাধারা বা সাহিত্যের চিন্তাধারা আপনার গাণিতিক চিন্তাধারাকে কি ব্যহত করে ? অথবা এগুলি আপনার গাণিতিক চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করে।

(প) আপনার আকর্ষণীয় সখ কি ? অবসর বিনোদন কি ভাবে করে থাকেন। ধর্ম, সৌন্দর্যতত্ত্ব আপনার কাছে কতটা আকর্ষণীয়।

(ফ) আপনি যখন আপনার বৃত্তিকরী কাজে নিমগ্ন থাকেন তখন কি করে এগুলি আপনার ব্যক্তিগত পাঠের সময় কাজে লাগান।

(ব) যখন কোন তরুণ গণিত নিয়ে চিন্তা করেন তখন আপনি তাঁকে কিভাবে অগ্রসর হবার জন্য পথ বলে দেন অর্থাৎ কি ধরণের উপদেশ আপনি দিয়ে থাকেন।

দশম অধ্যায়

গণিতের সঙ্কট

আজকাল অনেকেই মনে করে থাকেন গণিতশাস্ত্রে আর কিছু আবিষ্কার করার নেই, সবকিছুই আবিষ্কার করা হয়ে গেছে। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। বিজ্ঞানে কোন সমস্যা যদি না দেখা দেয় তাহলে সেই বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটেছে বলে ধরা যায়। ঠিক অনুরূপভাবে বলা যায়—গণিতে যদি সমস্যা না থাকে তাহলে গাণিতিক চিন্তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু সত্যই কি গণিতের মৃত্যু ঘটেছে বা ঘটছে ? বিশ্বের গণিতের পত্রিকাগুলি থেকে ফি বছরের হিসাব নিলে দেখা যাবে—অন্যূন ত্রিশ সহস্রাধিক প্রবন্ধ বছরে বের হচ্ছে। অবশ্য মানের দিক থেকে এগুলির অধিকাংশ ততটা উৎসাহজনক নয়। তবে কিছু কিছু প্রবন্ধ আছে যার অন্তর্গত তত্ত্বসমূহ মনে রেখাপাত করে এবং এ থেকেই প্রমাণিত হয় গণিতের মৃত্যু ঘটে নি। তাহলে কি গণিতের আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি ? হয়তো পাচ্ছি, কিন্তু কেন ? এই কেন'র উত্তর খুঁজতে গেলে সমস্যার অত্যন্ত গভীরে আমাদের পৌঁছাতে হবে। সমগ্র বিশ্বে বিজ্ঞানের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার সিংহভাগই ব্যয় করা হয় পরমাণুবিদ্যা ও জ্যোতির্পদার্থ বিদ্যায়। বাকী অংশের সিংহভাগ রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবৃত্ত প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার জন্য ব্যয় করা হয়। গণিতের জন্য বরাদ্দ করা হয় ছিঁটে ফোঁটা অর্থাৎ ধরতে গেলে নৈব নৈব চ। ফলে দেখা যাচ্ছে গণিতের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই শাখাকে হীন চোখেও দেখা হয়। সামাজিক কৌলিন্য রক্ষা করছে উপর্যুক্ত শাখাগুলি। ফলে মেধাবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ঐ দিকেই ঝুঁকেছেন। এভাব যদি চলতে থাকে তাহলে গণিতের অকালমৃত্যু ঘটতে বাধ্য। তখন হয়তো গণিতের শব ব্যবচ্ছেদ করে এর কারণ খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক।

গণিতের সঙ্কটের অন্যতম কারণ হিসাবে কাঠামোকে কিছুটা দায়ী করা যায়। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় একজন গণিতবিদ একটি বিশেষ ধরণের

গাণিতিক কাঠামো নির্মাণ করে দিলেন ; পরবর্তীকালে অথবা সমসাময়িক বহু গণিতবিদই ঠিক এই কাঠামোর মধ্যে তাঁদের চিন্তাধারাসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। ফলে গণিতের সামগ্রিক এবং মৌল উন্নতি ব্যাহত হয়। কারণস্বরূপ আমরা বলতে পারি গণিতের নির্যাস তার স্বাধীন চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত রয়েছে সুতরাং কোন বাঁধাধরা কাঠামোর মধ্যে তাকে যদি নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহলে হয়তো আমরা কিছু তত্ত্ব ও তথ্য পেতে পারি কিন্তু কোনমতেই সেই সমস্ত আবিষ্কার যুগান্তকারী হয়ে উঠবে না। পূর্বের কতগুলি গাণিতিক সংজ্ঞা সমূহের সমন্বয় সাধনই গণিত নয়। এ ধরণের সমন্বয় যে কেউ করতে পারে এবং এই সমন্বয় বহুভাবে করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের সমন্বয়ের মূল্য খুবই সামান্য। আবিষ্কারের অর্থ এই নয় যে এটি কতগুলি মূল্যহীন সমন্বয়। যে সমন্বয় প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তার সংখ্যা অতিশয় বিরল। আবিষ্কার অনেকাংশে নির্ভর করে বিচক্ষণতা ও নির্বাচন করার ক্ষমতার উপর। গাণিতিক আবিষ্কারের জন্য মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয়। কোন একটি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করি তখন হয়তো এ সম্পর্কে বেশ কিছুদিন কোন আলোকপাত আমরা করতে পারি না। তারপর ধীরে ধীরে তত্ত্বের মূল সম্পর্কে একটি ভাসা ভাসা ধারণা আমাদের মনে উঁকিঝুঁকি দেয়। হয়তো ট্রেনে চলেছি অথবা রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে আছি তখন সমস্ত মনসংযোগ দিয়ে সেই গাণিতিক সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হই। আসলে চেতন বা অবচেতন মনে সর্বদাই গাণিতিক তত্ত্ব ও তথ্য চিন্তার সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ এবং কিভাবে আমাদের চিন্তাশ্রিত গাণিতিক সমস্যায় প্রয়োগ করা যেতে পারে তা নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন। অর্থাৎ গাণিতিক চিন্তা হচ্ছে চেতন বা অবচেতন মনে একটি প্রতিধ্বনি বা প্রতিচ্ছবি। হঠাৎ মায়াজাল বিস্তারের মত এই সমন্বয় সাধন করা যা দীর্ঘ সময় চেতন বা অবচেতনা মনের দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে উত্থিত এবং তার অনেকাংশই গাণিতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ। এথেকে কি ধরে নেওয়া যায় যে—অবচেতন চিন্তা কোন স্বর্গীয় সত্তা মিশ্রিত ? অথবা সমস্তরকম চিন্তা ত্যাগ করে এ ধরণের চিন্তায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই কর্তব্য। হয়তো মহৎ অহমিকাপ্রসূত যান্ত্রিক কার্যকারীতার ফলেই এ ধরণের সমন্বয়ের সন্ধান আমরা পাই অথবা চেতনা-প্রসূত আকাঙ্খা থেকেও হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে গাণিতিক

চিন্তা আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে তার বেশ কিছুটাই যান্ত্রিক পদ্ধতিসম্ভূত অর্থাৎ যান্ত্রিকভাবে আমরা আমাদের গাণিতিক চিন্তাধারাকে নিয়োজিত করছি। যে গাণিতক তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের জানা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো অথবা পূর্বের সম্পর্ক থেকে একাধিক সর্ত আরোপ করে একটা কিছু খাড়া করার নীতিই আমরা আজকাল দেখতে পাচ্ছি। যার ফলে গণিতের ক্ষেত্রে নূতন সত্যের সন্ধান বড় একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্বে গণিতের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তায় ভাঁটা চলছে। পূর্বের মত যুগান্তকারী আবিষ্কার আমাদের চোখে পড়ে না। চোখে পড়েনা গোডেল, হিলবার্ট, কাঁর্তা প্রমুখ গণিতবিদদের মত সেই মৌল গাণিতিক চিন্তাধারা। ধরতে গেলে গাণিতিক চিন্তাধারায় চলছে চর্বিত চর্বণ। তত্ত্বের দিক থেকে এগুলি হয়তো চোখ ধাঁধাতে পারে, হতে পারে প্রতীক চিহ্নের উন্নততর বিন্যাস কিন্তু এইসব গাণিতিক চিন্তাধারা একটি নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মনে হয় মৌল গাণিতিক চিন্তায় ভাঁটা পড়ছে। জোয়ার যখন ছিল তখন সৃজনশীল চিন্তাধারার লোক এদিকে ঝুঁকতেন। আজ আর সে কৌলিন্য নেই। বর্তমানে মৌল চিন্তাশ্রয়ী গণিতবিদের বড়ই অভাব। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে এ ধরণের গণিতজ্ঞদের অভাব প্রকট। যা কয়েকজন আছেন তা পাশ্চাত্য জগতে। বর্তমানে যে সহস্র সহস্র গবেষণাপ্রসূত তত্ত্ব আমাদের সন্মুখে উপস্থিত হচ্ছে—সেই সব তত্ত্বের ভিত্তি কি? এগুলি কি আকস্মিক ঘটনা নাকি দৈব দুর্ঘটনা। বহু গণিতবিদ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের গণিতবিদদের চেতনায় যে উত্তেজনা তা হয়তো মনোযোগকে ব্যাহত করে যদি সেই চিন্তা কারণপ্রসূত না হয়। হয়তো চেতনা গাণিতিক প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হয়। প্রকৃত গণিতবিদ মাত্রেই বলবেন—চেতনাপ্রসূত চিন্তা না এলে গণিতে মৌল আবিষ্কার সম্ভব নয়। গণিতের যে নিজস্ব সত্তা আছে আজকাল গণিতজ্ঞদের মধ্যে অধিকাংশই সে নিয়ে মাথা ঘামান না। বর্তমানে চলছে গাণিতিক চিন্তাধারায় একরকম যুদ্ধ। ফলে গণিত তার সৌন্দর্য থেকে বিচ্যুত। আমরা নিশ্চয়ই জোর দিয়ে বলতে পারি যদি কোন বস্তু তার সৌন্দর্যকে হারিয়ে ফেলে তাহলে তার বৈশিষ্ট্যের অনেককিছুই হারিয়ে ফেলে। গণিত তার সৌন্দর্য হারিয়ে বৈশিষ্ট্যচ্যুত হতে চলেছে। গাণিতিক চিন্তায় যাঁরা নিয়োজিত তাঁদের ধারণা কিছুএকটা করতে হবে এবং এঁরা দৈনন্দিন

চিন্তাযুদ্ধের শিকার হন। অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সব তত্ত্ব আছে তা থেকেই কসরত করে কোন একটা কিছু দাঁড় করবার প্রবণতাই এঁদের বেশী। ধরতে গেলে ন্যায়বিদ্যার সাহায্যে তাঁরা চিন্তাযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু গাণিতিক চিন্তায় প্রেম না আনলে আমরা সৌন্দর্যবর্জিত কিছু প্রতীক চিহ্নের বিন্যাস দেখতে পাবো। গণিতের সঙ্কট অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের মনে রাখা দরকার কি ধরণের গাণিতিক সত্তা, গাণিতিক সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যসম্ভূত ভাবাবেগের সন্ধান পেলে গণিতের সংকট কিছুটা অথবা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে। হয়তো বলা যেতে পারে—অধ্যবসায়, অবিচ্ছিন্ন চিন্তা, নির্বাচনের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা প্রভৃতি মৌলিক আবিষ্কারের অন্যতম উপাদান।

অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তাধারা থেকেই গনিতের উৎপত্তি। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতাপ্রসূত গাণিতিক চিন্তাধারা ক্ষীয়মান হতে চলেছে। যদি গাণিতিক ধারণা বা প্রত্যয়ের আদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে এই ধারণা কতগুলি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমতঃ এই প্রত্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কারণস্বরূপ বলা যায়—গণিতবিদরা গণিতের নানাশাখার উপর গবেষণা করছেন, এর জন্য নূতন নূতন ধারণা বা প্রত্যয়ের ক্রমবিকাশ ঘটছে। দ্বিতীয়ত গাণিতিক গবেষণা যত বেশী এগিয়ে যাচ্ছে ততই অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান থেকে গণিত দূরে সরে যাচ্ছে। এবং আরো বেশী মানব মনের গহনতল থেকে এ চিন্তাধারা উত্থিত হচ্ছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ধারণার ক্রমবিকাশ উন্নতমুখী তবে তার মান কি সেটা বিতর্কিত। তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে বিমূর্ত গণিতের উদ্ভব তা মনন সৃষ্ট বিমূর্ত গণিতের চেয়ে উন্নত এবং এই হেতু পূর্বতন ধারণাই গাণিতিক চিন্তাধারার মূল অতএব এই চিন্তা কঠিন। আজকাল গাণিতিক চিন্তাধারা এত বেশী বিমূর্ত যে অনেকক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তাধারায় সহায়ক হয় না। এবং ক্রমশঃ এই চিন্তা জটিল হয়ে পড়ছে এবং এর চর্চা সীমাবদ্ধভাবেই হচ্ছে। এ যদি হয় তাহলে ধীরে ধীরে এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে যখন মাত্র কয়েকজন গণিতজ্ঞই এই শাখায় বিচরণ করবেন। এভাব কিন্তু গণিতের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। বলাবহুল্য এই হানিকর প্রয়াসেই বর্তমান বেশীরভাগ গণিতবিদ মেতে রয়েছেন।

গণিতশাস্ত্রের যে কোন শাখার অন্যতন প্রধান উপাদান হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ। যে ধারণা বা প্রত্যয় এই স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে জড়িত রয়েছে তা মৌলিক ও স্বয়ংসিদ্ধ। বর্তমান গণিতে স্বতঃসিদ্ধ উপাদানটি লুপ্ত হতে চলেছে। স্বতঃসিদ্ধ থেকেই অবরোহ পদ্ধতিতে গাণিতিক তত্ত্ব ও উপপাদ্যের সৃষ্টি হয়। এই অবরোহ পদ্ধতিতে প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্রমেই বিশেষজ্ঞদের অনুধাবন করার বিষয় হয়ে উঠছে। শেষে এমন দিন আসবে যখন মনে হবে এগুলি রাইণ্ড ম্যাথেমেটিক্যাল পেপিরাসের হাইরেটিক বা হাইরোগ্লিফিক লিপি ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ গণিতের ক্ষেত্রে চিন্তা সাশ্রয়ী নীতির ফলে আমরা হয়তো হাইরোগ্লিফিক যুগে ফিরে যাচ্ছি।

পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি শাখাকে একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেওয়া হয়। যদি কোন বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন তাঁর তত্ত্ব জনসাধারণ বুঝুন আর নাই বুঝুন কিন্তু সেই তত্ত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন এবং বিশেজ্ঞরাও উপলব্ধি করছেন তাহলে তার মনের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা আরও বেশী সৃজনশীল চিন্তায় নিয়োজিত করতে সাহায্য করে। জনসাধারণের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট এবং এ ব্যাপারে নোবেল পুরস্কার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে যতই যুগান্তকারী আবিষ্কার করা হোক না কেন তার জন্য এ ধরণের উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই। ফলে সৃজনশীল চিন্তাবিদরা এ দিকে বড় বেশি ঝুঁকছেন না। এ অবস্থা আরও কিছুকাল চলতে থাকলে গণিতের ক্ষেত্রে মামুলী তত্ত্বের আবিষ্কার ছাড়া আর কিছু করা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—আগেও তো নোবেল পুরস্কার ছিল এবং কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে ছিল না তবুও গণিতের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভব হল কি করে? এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় মানুষ আজকাল বাস্তবমুখী ফলে তার গবেষণা কার্য যদি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা না পায় তা'হল কেনই বা সে এ ধরণের গবেষণা চালিয়ে যাবে? আজকাল কোন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্রকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—বড় হয়ে তুমি কি হবে। সে উত্তর দেবে—হয় পদার্থবিদ না হয় রসায়নবিদ না হয় ডাক্তার হবে অথবা পদস্থ কর্মচারী। আর ভারতীয় ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলে তারা এগুলি ছাড়াও I. A. S. বা চার্টাড এ্যাকাউন্টটেন্ট হবার বাসনা

জানাবে। খুব কম সংখ্যক ছাত্রই জানাবে—সে গণিতজ্ঞ হবে। পরবর্তীকালে যারা গণিত নিয়ে পড়তে আসে তারা উক্ত শাখাগুলিতে স্থান না পেয়ে অগত্যা গণিতশাস্ত্রে প্রবেশ করার জন্য ছাড়পত্র জোগাড় করার চেষ্টা করে। আগে এমনটি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে গণিতের প্রতি এদের শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ কোনটাই নাই। মনে হয় গণিতের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার ছাপ ভারত তথা উন্নয়নশীল দেশের লোকেরা ততটা রাখতে পারছে না তার অন্যতম কারণ হিসাবে এই অবস্থাকে দায়ী করা যায়। উন্নত দেশগুলিতে এ সমস্যা এতটা প্রকট নয়। তারা গণিতকে কিছুটা মর্যাদা দেয়। মনে হয় ভারত তথা উন্নয়নশীল দেশগুলি বিজ্ঞানের সেই সমস্ত শাখার প্রতি নজর দেয় যার তাৎক্ষণিক কোন মূল্য থাকে। গণিতের ক্ষেত্রে এ ধরণের তাৎক্ষণিক মূল্য না থাকায় সমস্যা ধীরে ধীরে অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করছে। বলা বাহুল্য যুগান্তকারী গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে বোরেল, দিদোনে, লেফসেক, কাঁর্তা, ইলেনবার্গ, কোহেন. প্রমুখদের কর্মধারা সম্পর্কে জনমানসে কোন ছবি ফুটে ওঠে নি। কিন্তু দেখুন—এ্যাষ্টন, বোর, ও ব্রগলী প্রমুখদের কর্মধারা জনসাধারণ বুঝুন আর নাই বুঝুন তাঁরা যে যুগান্তকারী কাজ করেছেন সে ধারণা তাঁদের মধ্যে প্রকট। আর এ ব্যাপারে নোবেল পুরস্কারের মত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের আশু কর্তব্য কি? মনে হয় এ ব্যাপারে International Congress of Mathematician (I. C. M.) নামে সংস্থার সদস্যরা নূতন গাণিতিক নীতি স্থির করুন। নোবেল কমিটিকে জানাতে হবে তোমরা গণিতে যদি পুরস্কার না দাও তা হলে গণিতের সামগ্রিক উন্নতি হ্রাস পাবে। এবং এ ব্যবস্থা যদি না করা যায় তাহলে এমন দিন আসবে যখন মৌল গাণিতিক আবিষ্কার স্তব্ধ হয়ে যাবে। ফল স্বরূপ দেখত পাব বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

তত্ত্ব ও তথ্যসমূহের আকর (ইংরাজী)

(1) Bush, Douglas—Science and English Poetry. 1950

(2) Childe, V. Gordon—Man makes himself. 1950

(3) Crum, Ralph B—Scientific thought and poetry—1931

(4) Dampier Whetham William C. D.—A History of science and its relations with philosophy and Religion. 1929

(5) Descartes, Rene—Discourse on Method. 1960

(6) Farrington, Benjamin—Greek Science. 1961

(7) Ivins, William M. Jr—Art and Geometry. 1964

(8) Jeans, Sir James—The growth of physical Science. 1958

(9) Jeans, Sir James—Science and Music. 1961

(10) Kline, Morris—Mathematics and the Physical world. 1963

(11) Kline Morris—Mathematics : A Cultural Approach. 1962

(12) Panofsky, Erwin—Meaning in the visual Arts, 1971

(13) Russell, Bertrand—A History of Western Philosophy, 1957

(14) Snow, C. P.—The two cultures, and the scientific Revolution 1964

(15) Whitehead, A. N.—Science and the Modern world 1938

(16) Hadamard, J.—An Essay on the Phychology of invention in the Mathematical field. 1954

(17) Campbell, N.—What is Science. 1953

(18) Sakharov, Andrei D—Progress, co-exitence and intellectual Freedom. 1968

(19) Vavoulis, Alexandar and Colver, A wayne—Science and Society selected essays—1971

(20) Lionnais, F. Le—Great Currents of Mathematical thought, vol. 1, 2, 1971

(21) Cornforth, Maurice—Dilectical Materialism, 1965

(22) Burtt, Edwin Arthur—The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. 1950

(23) Moritz, Robert Edouard—On Mathematics. 1958

(24) Smith, D. E.—The Poetry of mathematics—Scripta Mathematica, 1934

(25) Halmos, P. R.—Mathematics as a creative art. The American Scientist, vol. 56, 1968 pp 375—389

(26) Majumdar, Pradip Kumar—Crisis in Mathmatics. International Journal of mathematical education in science and Technology, London 1978

(27) D. Ambrosio, ubiratan—Mathematies and Society : Some Historical Consideration and pedagogical implication—International Journal of Mathematical education in Science and Technology London, vol 11, 1980 Pp 479—486

(28) Frederick Engels—Anti-Duhring.

(29) Bertrand Russell—Our Knowledge of the external world : As a field for scientific metheod in philoophy.

(30) Bibhuti Bhusan Datta—The Science of Sulba, 1932

তত্ত্ব ও তথ্যসমূহের আকর (বাংলা)

(1) বিজ্ঞানের দার্শনিক—ম্যাক্স কামিংস ও রবার্ট এন লিন্স্কট্ অনুবাদক—ফওজুল করিম, 1975

(2) সাহিত্য ও বিজ্ঞান—অল্ডাস হাক্সলে, অনুবাদক দেবব্রত রেজ, 1966

(3) বিজ্ঞান ধর্ম—শ্রীসতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, 1870 শকাব্দ

(4) বিজ্ঞানের ইতিহাস ২য় খণ্ড —সমরেন্দ্র নাথ সেন

(5) রহস্যবাদ ও যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ—বার্ট্রান্ড রাসেল (অনুবাদক—আবু সাঈদ মিঞা)

(6) প্রাচীন ভারতে গণিত চর্চা—প্রদীপ কুমার মজুমদার।

(7) পৃথিবীর ইতিহাস (৩য় খণ্ড)—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(১) বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা সাহিত্য ও গণিত, গণিত ও ধর্ম প্রবন্ধদুটি এখানে সংযোজন করেছি। এজন্য বাংলা একাডেমী (ঢাকা, বাংলাদেশ) কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

(2) J-Hadamard'এর An Essay on the Phychology of invention in Mathematical field বই থেকে (ক) থেকে—(ব) পর্যন্ত অংশটুকু প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এজন্য বইটির লেখক এবং প্রকাশকের নিকট কৃতজ্ঞ।

(৩) দেবব্রত রেজ অনূদিত সাহিত্য ও বিজ্ঞান গ্রন্থ থেকে বিশেষ সাহায্য নিয়েছি। এজন্য ঐ গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ।